KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 X 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৩/৯ ৫৩/১০ ৫৩/১১ ৫৩/১২	Year of Publication পৌষ ১৩৯৭ ॥ Jan 1991 মাঘ ১৩৯৭ ॥ Feb 1991 ফাল্গুন ১৩৯৭ ॥ March 1991 চৈত্র ১৩৯৭ ॥ April 1991
	Condition : Brittle Good
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ১২ এপ্রিল ১৯৯১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

অনগ্রসরতা কি কেবল তফসিলিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সংরক্ষণ দিয়ে অনগ্রসরতা দূরীকরণ সম্ভব? না হলে বিকল্প কী? এইসব জিজ্ঞাসার অনুসন্ধিৎসায় অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সন্দর্ভ "অনগ্রসরতা ও সংরক্ষণ"।

মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ নিয়ে যে জাতীয় বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে, আম্বেদকরের জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবন ও ভাবনার আলোয় সেই বিতর্কের মূল্যায়ন করেছেন ড· দেবী চ্যাটার্জী।

"যামিনী রায় ও আমরা"—আলেখ্যর দ্বিতীয় অংশ।

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"র সংগ্রহণপর্বে দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসগুলির বিকাশের ব্যাকগ্রাউন্ড।

উপসাগরীয় যুদ্ধ নিয়ে মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছন্দোবদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

"অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়" নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ।

"কবিতার তৃতীয় বিশ্ব" নিয়ে গ্রন্থসমালোচনা।

আঙ্গামী নাগাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি আলেখ্য।

সহৃদয়জনের বন্ধুত্বকামনা এবং সৃজনশীলতার মধ্যে নারীর শিল্পীসত্তার বিকাশশীলতাকে পারিপার্শ্বিক সঠিকভাবে স্বীকৃতি না দেয়ার করুণ পরিণতি নিয়ে এবারের ভিন্নস্বাদের গল্প "অবৈধ"।

*** *** ***

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
মিরাশা হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থতা,
প্রত্যেক উল্লাস আর স্বপ্নের বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
এর জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ১২
এপ্রিল ১৯৯১
চৈত্র ১৩৯৭

অনগ্রসরতা ও সংরক্ষণ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৯২৫
ড. আম্বেদকর, ভারতের পশ্চাৎপদ মানুষ দেবী চ্যাটার্জি ৯৩৭
অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা অরুণা হালদার ৯৪৬
যামিনী রায় ও আমরা প্রণতি দে ৯৭৭

উপসাগরীয় যুদ্ধের জর্নাল অন্নদাশঙ্কর রায় ৯৩২

আমার কমল ফিরে দাও আনন্দ ঘোষ হাজরা ৯৩৩
স্মৃতিবাহিত সুকুমার চৌধুরী ৯৩৪
অভিযাত্রীর গান উজ্জ্বল সিংহ ৯৩৫
গোরস্থানের কঙ্কাল ইনাস উদ্দীন ৯৩৬

অবৈধ মীনাক্ষী ঘোষ ৯৬৭

গ্রন্থসমালোচনা ৯৮৭
আজহারউদ্দীন খান, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, গৌতম নিয়োগী,
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রতিবেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি ১০০২
আঙ্গামী সংস্কৃতি কিরণশঙ্কর মৈত্র

মতামত ১০১০
সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণু গুহঠাকুরতা, মলয় রায়চৌধুরী,
দিবাকর চৌধুরী, সোমা মুখোপাধ্যায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

নতুন দিগন্তের সন্ধানে
দুর্গাপুর ইস্পাত

প্রতিদিন থেকে প্রতি অন্যদিন,
এগিয়ে চলেছে মানুষ একপা একপা করে
দৃঢ় পদক্ষেপে প্রগতির পথে।
সৃষ্টি হচ্ছে নতুন ধ্যান-ধারণার,
উন্মোচিত হচ্ছে নতুন দিগন্ত···
তীব্রতর হচ্ছে আগামী দিনে
এগিয়ে যাবার চ্যালেঞ্জ।

অগ্রগতির এই চেতনায়
উদ্দীপ্ত দুর্গাপুর ইস্পাত আজ
নতুন সংকল্পের সামিল।
আজ সে প্রস্তুত—আগামী দিনগুলি
আরও বেশী উৎপাদনে,
আরও বেশী কর্ম্মদক্ষতায়, পরিসেবায়
পরিপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে।

স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা

অনগ্রসরতা ও সংরক্ষণ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৯০ সালের মধ্যভাগে ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং হঠাৎ ঘোষণা করে দেন যে অনগ্রসর শ্রেণী সংক্রান্ত মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট তাঁরা অবিলম্বে কার্যকর করবেন। এর অল্প দিন পরে, গত বছরের অগস্ট মাসে এ সম্পর্কে সরকারি নির্দেশও জারি করা হয়, যে নির্দেশের মর্মার্থ ছিল এই যে তফসিলি জাতি-উপজাতি এবং সামাজিক ও শিক্ষাগত বিচারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য চাকুরিতে মোট ৪৯'৫ শতাংশ পদ ও আসন সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষণ সংক্রান্ত এই নির্দেশ জারি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে কোনো রাজনৈতিক দল ছিলেন না, ছিলেন উচ্চবর্ণের শিক্ষিত যুবগোষ্ঠী এবং ছাত্র-ছাত্রীরা। বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীদের কেউ-কেউ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আত্মাহুতিও দেন। সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন যখন এইভাবে তুঙ্গে, তখন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং দূরদর্শনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে দৃশ্যত বেদনার্ত ভঙ্গিতে তিনি বলেন যে ছাত্রদের আন্দোলন ও আত্মাহুতিতে তিনি যে দুঃখ শোক পেয়েছেন, তাঁর তিরিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এমনতর অভিজ্ঞতা তাঁর আর কখনও হয় নি। একই সঙ্গে বিভ্রান্ত তরুণদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে আলোচনার টেবিলে তাঁর সঙ্গে বসার জন্য আহ্বান জানান। এই আলোচনা অবশ্য আদৌ শুরু করা যায় নি। কারণ ইতিমধ্যে বি. জে. পি. ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অযোধ্যা অভিযান যে ঝড় তোলে তাতে অনিবার্যভাবেই স্তিমিত হয়ে পড়ে সংরক্ষণ ইস্যু ও সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন, এবং চূড়ান্ত পরিণামে সংরক্ষণের প্রবক্তা বিশ্বনাথপ্রতাপ-সরকারকে বিদায় নিতে হয়।

অবশ্য সংরক্ষণ নিয়ে সরকারি উদ্যোগে কোনো আলোচনা শুরু করা না গেলেও গত এক বছরে এ বিষয়ে দেশ জুড়ে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও বিতর্ক নিতান্ত কম হয় নি। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এতৎসত্ত্বেও সংরক্ষণ তথা অনগ্রসর শ্রেণীর যথার্থ কল্যাণ সাধন সম্পর্কে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি, বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে বিভিন্ন পক্ষই নিজ-নিজ অবস্থানে অনড় থেকেছেন। অথচ বিষয়টি এমন যার সমাধানসূত্র ঐকমত্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করা সবিশেষ জরুরি। কারণ ভারতবর্ষে দরিদ্র ও অনগ্রসর শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং তাঁদের সীমাহীন দুঃখ-ক্লেশ একটি বাস্তব ঘটনা যা আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড়ো কলঙ্ক। এই কলঙ্ক-মোচনে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি যথার্থই আগ্রহী এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ এদেশের

রাজনীতিকেরা সমস্যার সমাধান চান না, তাঁরা সমস্যা জিইয়ে রাখতে চান যাতে প্রয়োজনে তাঁরা একে কাজে লাগাতে পারেন নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে। কাজেই যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে সংরক্ষণের প্রস্তাব তার সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির। এ ছাড়া, নিছক তাত্ত্বিক স্তরে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, এই কঠিন বাস্তব সমস্যার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন একান্ত বাস্তবানুগ পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন চলার সময় শ্রীবিশ্বনাথপ্রতাপ সিং প্রতিবাদী তরুণদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চাইলেও আজ এই মুহূর্তে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা বা বোঝাপড়ায় তাঁরা আদৌ আগ্রহী নন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে সংরক্ষণকে প্রধান ইস্যু করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই সংরক্ষণের প্রস্তাবই যে তাঁদের ভোটের বাক্স ভরিয়ে দেবে, এ বিষয়ে তাঁরা সুস্পষ্টতই নিঃসংশয়। অনগ্রসর শ্রেণীর অনুকূলে চাকুরিতে ব্যাপক সংরক্ষণের প্রস্তাবটি নির্বাচনের প্রধান ইস্যু করে জনতা দল তথা জাতীয় ফ্রন্ট ভুল করছেন কি ঠিক করছেন, সেটি রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় এবং এই প্রস্তাবের নৈতিকতা অথবা অনৈতিকতা বিচারের দায়িত্ব এ দেশের জনসাধারণের তথা ভোটদাতাদের। তবে এতদ্দ্বারা যে জিনিসটি আমাদের সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে তা হল এই যে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনের কল্যাণে সংরক্ষণ আবার জাতীয় ইস্যু হয়ে উঠতে চলেছে এবং যেহেতু এই ইস্যুতে এখনও পর্যন্ত একটি সর্বসম্মত সমাধানের পথ আমরা খুঁজে বের করতে পারি নি, সে কারণে এ বিষয়ে অবশ্যই আলোচনার অবকাশ আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

দুই

স্বাধীন ভারতবর্ষে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কাজ করে চলেছে চার দশক ধরে। একটি আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে এই গণতন্ত্র আজও অটুট, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনধারায় গণতন্ত্র কার্যত অনুপস্থিত। অর্থাৎ, ভারতীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক স্তর থেকে সামাজিক স্তরে আদৌ উত্তরিত হতে পারে নি, এবং এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থার বিচিত্র গড়ন। ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা এই যে ব্যক্তিগত সম্পদ, সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার নিরিখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক রয়েছে, এবং রাজনৈতিক স্তরে নানা প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত এই সমস্যার কোনো সমাধান হয় নি। এই সমস্যা একদিনে দেখা দেয় নি, ভারতীয় ইতিহাসের দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা ধীরে-ধীরে জটিল আকার ধারণ করেছে এবং এর পিছনে কারণও একটি নয়, অনেক। প্রথম ও প্রধান কারণ অবশ্যই ভারতীয় হিন্দু সমাজের সনাতনী জাত- বা বর্ণপ্রথা। এই বর্ণপ্রথা হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শুধু যে অপরিবর্তনীয় ব্যবধান রক্ষা করে চলেছে তাই নয়, একই সঙ্গে উচ্চবর্ণরূপে চিহ্নিত কয়েক শ্রেণীর মানুষের হাতে বিশেষ সামাজিক মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা অর্পণ করে নিম্নবর্ণের ওপর উচ্চবর্ণের আধিপত্যের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। প্রাচীন ভারতে এই আধিপত্য ছিল মূলত সামাজিক। কিন্তু কালক্রমে, বিশেষ করে ব্রিটিশ ভারতে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের শাখা-প্রশাখা সুবিস্তৃত হলে এবং আধুনিকতার প্রবর্তনে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধার দরজা খুলে গেলে সর্বতোভাবে লাভবান হতে থাকেন শুধু উচ্চবর্ণের মানুষেরা। সমস্ত রকমের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাঁরা যত এগোতে থাকেন ততই পিছিয়ে পড়তে থাকেন নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী যাঁদের ভাগ্যে জুটতে থাকে সীমাহীন লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও উৎপীড়ন। এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন যাত্রা শুরু করে তখন দেখা যায় যে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা নিম্নবর্ণের তাঁদের প্রায়

সকলেই সব দিক থেকে অনগ্রসর এবং এই অনগ্রসরতার মূল কারণ তাঁদের চূড়ান্ত দারিদ্র্য। সাধারণ চিত্রটি এরকম হলেও কিছু ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল। যেমন, ঘটনাচক্রে অথবা আকস্মিক কোনো যোগাযোগের সূত্র ধরে কোনো-কোনো নিম্নবর্ণের মানুষের পক্ষে জন্মগত দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। বর্ণ এঁদের ক্ষেত্রে স্বভাবতই কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নি, কারণ জন্মসূত্রে নিম্নবর্ণীয় হলেও এঁরা সব দিক থেকেই ছিলেন অগ্রসর এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার বিচারে অবশ্যই উচ্চবর্ণের সমগোত্রীয়। স্বাধীনতার প্রায় চুয়াল্লিশ বছর পরেও এই অবস্থায় কোনো পরিবর্তন হয় নি। নিম্নবর্ণের যে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন তফসিলি জাতি ও উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত, তাঁরা প্রায় সকলেই অনগ্রসর, কারণ তাঁরা দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের কারণেই তাঁদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা, এই দারিদ্র্যের কারণেই তাঁরা নানাবিধ সুযোগ থেকে বঞ্চিত অথবা সুযোগ পেলেও তাকে কী ভাবে নিজেদের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাতে হয়, তা তাঁদের জানা নেই। আবার তাঁদের মধ্যেই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ আছেন যাঁরা নিম্নবর্ণের হয়েও বিত্তশালী এবং এ কারণেই অনগ্রসরতার বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসে উচ্চবর্ণের সঙ্গে একাসনে বসার ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছেন।

অনগ্রসর নিম্নবর্ণের মধ্যে যেমন ব্যতিক্রম আছে, তেমনই ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ এদেশের উচ্চবর্ণ সাধারণত প্রাগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও এঁদের মধ্যে এখন কেউ-কেউ আছেন যাঁরা ভাগ্যের হাতে মার খেতে-খেতে চরম দারিদ্র্যে লাঞ্ছিত। এই দারিদ্র্যের কারণে উচ্চবর্ণের হয়েও এঁরা অনগ্রসর এবং স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চবর্ণের অভিমান ও সংস্কার থেকে মুক্ত। এই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় যেখানে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বিধবা কর্ত্রী মুড়ি ভেজে ও ধান সিদ্ধ করে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছেন, অন্নসংস্থানের তাড়নায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন নি, এবং যে পরিবারের ছেলেরা উঁচু জাতের অভিমান ত্যাগ করে মফসসল শহরে রিকশাচালক হয়েছে অথবা গ্রামে তাঁত বুনছে।

এইসব ব্যতিক্রম বাদ দিলে সামগ্রিক বিচারে যে সত্য অস্বীকার করা যায় না তা হল এই যে ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে বর্ণপ্রথা দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা পরস্পর-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে এদেশে বর্ণপ্রথাই দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার একমাত্র প্রেক্ষাপট নয়। অর্থাৎ, অনগ্রসর শ্রেণী রয়েছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যেই এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য সংখ্যালঘুত্বের কারণেই এই অনগ্রসরতা, এই ধারণাও ঠিক নয়। ভারতবর্ষের পারসি সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হয়েও সব দিক থেকে প্রাগ্রসর, অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ ভয়াবহ দারিদ্র্যের প্রকোপে অন্যদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছেন। এখানে সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দিয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে। যেমন, মুসলিমদের অনগ্রসরতার একটা বড়ো কারণ এই যে ইংরেজ শাসনের সর্ববিধ সুফল করায়ত্ত করার জন্য হিন্দুরা যে ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা দেখাতে পেরেছিলেন, বিদেশী শাসক সম্পর্কে দ্বিধান্বিত মুসলিমরা গোড়ার দিকে সেই ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতা একেবারেই দেখাতে পারেন নি। এর ফলে উনবিংশ শতাব্দীতেই যখন হিন্দুদের মধ্যে নিত্য নতুন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব হতে থাকে, তখনও মুসলিমদের অবস্থাটা প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। তাঁদের ক্ষুদ্র এক অংশ ভূস্বামী ও জমিদার হিসাবে সমাজের ওপরতলায় আসন লাভ করলেও নতুন-নতুন বৃত্তিকে অবলম্বন করে আর্থিক দিক থেকে সম্পন্ন হওয়ার সমস্ত সুযোগের দরজাই প্রায় বন্ধ থাকে সাধারণ মুসলমানের সামনে। এই ঐতিহাসিক

প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে আজ ভারতবর্ষে দেখা যায় যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ শ্রমজীবী, ক্ষুদ্রচাষি, ভূমিহীন কৃষক অথবা দিনমজুরের ভূমিকায় দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে রত এবং তাঁদের অনগ্রসরতা তফসিলি জাতি ও উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীর তুলনায় কিছু কম নয়।

সংস্কৃতিগত সমস্যাও যে সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনগ্রসরতার কারণ হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতবর্ষের অ্যাংলো-ইনডিয়ান সম্প্রদায়। ব্রিটিশ শাসনে নানা ধরনের বিশেষাধিকার ভোগ করার ফলে তাঁরা নিজেদের আর্থিক দিক থেকে এক উন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এছাড়া আচরণে ও জীবনধারায় ইংরেজি সংস্কৃতি আত্মস্থ করে ভারতবর্ষে বাস করেও তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। স্বাধীন ভারতবর্ষে তাঁদের বিশেষাধিকার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে তাঁরা আক্রান্ত হন এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায়। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো ব্যাপার হল এই যে, নিজেদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁদের মনেপ্রাণে ভারতীয়তা অর্জনে বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত হতে এঁদের অনেকে বিদেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু যাঁরা এদেশেই থেকে যান গত চার দশক ধরে ভারতীয় মূল জীবনস্রোত থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হতে-হতে তাঁরা আজ আচ্ছন্ন এক চরম দ্বীপমণ্ডুকতায়, যে কারণে দেখা যায় যে নানা ধরনের বৃত্ত ও পেশা থেকে তাঁরা ক্রমশই সরে আসছেন এবং এর ফলে ভারতবর্ষের অ্যাংলো-ইনডিয়ান সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশ আজ আমাদের চোখের আড়ালে এক-এক করে জন্মায়েত হচ্ছেন দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অন্ধগলিতে।

তিন

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তার ভিত্তিতে একথা সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা ভিন্ন-ভিন্ন আকারে উদ্ভূত হলেও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনগ্রসরতার প্রকৃত উৎস দারিদ্র্য। অতএব হিন্দুসমাজে যেসব নিম্নবর্ণের মানুষকে অনগ্রসরতার বোঝা কাঁধে নিয়ে মাথা হেঁট করে জীবন চালাতে হয়, তাঁদের দারিদ্র্য মোচন করা সম্ভব হলে তথাকথিত বর্ণভেদের হীনতাকে ধুলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে তাঁরা সহজেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। একইভাবে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব অনগ্রসর গোষ্ঠী আছেন তাঁদের নিদারুণ অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করতে পারলে স্বভাবতই তাঁরা মুক্ত হবেন সবরকমের দীনতা ও হীনম্মন্যতা থেকে। এই পরিস্থিতি যদি আমরা আনতে পারি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে একটা ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যদি আমরা পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে সামাজিক ব্যবধান সম্পূর্ণ দূর না হলেও মানুষে মানুষে সামাজিক দূরত্ব অনেকটাই কমে আসবে এবং সেক্ষেত্রে ভারতীয় গণতন্ত্র প্রকৃতই অর্থবহ হয়ে উঠবে আমাদের সমাজ-জীবনে।

এখন প্রশ্ন এই যে, সংরক্ষণই এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ কি না। যাঁরা মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণের প্রবক্তা সেই রাজনীতিকেরা অবশ্যই সংরক্ষণকে অনগ্রসরতা দূরীকরণে এক বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করেন। অন্যান্য প্রায় সব রাজনৈতিক দলই সংরক্ষণকে নীতিগতভাবে বিরোধিতা করেন নি, যদিও বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-এর উদ্যোগের তাঁরা সমালোচনা করেছেন। অনগ্রসর শ্রেণীর দুঃখ-মোচনে ভারতীয় রাজনীতিকদের এই আগ্রহ ও উদ্যোগ কতটা আন্তরিক, সংরক্ষণ সম্পর্কিত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে তথাকথিত ভোটের রাজনীতি কতটা সক্রিয় সে বিচারের ক্ষেত্র বর্তমান নিবন্ধ নয়। তবে এই প্রসঙ্গে দুটি বাস্তব ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা সম্ভবত অসঙ্গত হবে না। প্রথমত, গত চুয়াল্লিশ বছরে দরিদ্র, অনগ্রসর দেশবাসীর দুঃখ-

মোচনের জন্য আমাদের সম্মানিত রাজনীতিক তথা রাজনৈতিক দলগুলি অনেক গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অনেক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন, অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেছেন, কিন্তু অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসে নি, তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, সংবিধান প্রবর্তনের পর থেকে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য যে সংরক্ষণব্যবস্থা এযাবৎ কার্যকর আছে তাতে প্রকৃত কাজের কাজ কিছুই হয় নি। কারণ, এইসব সরকারি সুযোগ-সুবিধার প্রায় সবটাই ভোগ করে চলেছেন তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে উদ্ভূত ক্ষুদ্র এক সম্পন্ন এলিট গোষ্ঠী যাঁদের কথা এই নিবন্ধে আগেই উল্লেখিত হয়েছে।

কেউ-কেউ মনে করেন যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে তা হবে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, কারণ এর দ্বারা ভারতবর্ষের নীচুতলার মানুষ সর্বপ্রথম উঁচুতলার জনসম্প্রদায়ের আধিপত্যে আঘাত হেনে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাবেন। তাত্ত্বিক বিচারে যুক্তিটি অভ্রান্ত, কিন্তু এর কোনো বাস্তব মূল্য নেই। ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের পর্যাপ্ত গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত, এবং এই অধিকার রক্ষার যথাযোগ্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের বিচারালয়কে। কিন্তু আমাদের দেশে যে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচে, খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসার অভাবে যাঁদের বেঁচে থাকাটাই অনিশ্চিত, বাসস্থানের অভাবে পথঘাটই যাঁদের আশ্রয়মূল, তাঁদের কাছে ভারতীয় নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারের দীর্ঘ তালিকা নিছক এক অর্থহীন শব্দমালা ছাড়া আর কিছুই নয়। একইভাবে বলা যায় যে অনগ্রসর শ্রেণীর অনুকূলে চাকুরিতে ব্যাপক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে তার দ্বারা তাঁদের হাতে অবশ্যই তুলে দেওয়া যাবে কাগজে-কলমে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, কিন্তু এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের বৈষয়িক অবস্থার কোনো হেরফের ঘটবে না। ঘটবে না তার কারণ এই মুহূর্তে দেশে চাকুরিই নেই। ভারতবর্ষে এখন যদি পর্যাপ্তসংখ্যক চাকুরির সুযোগ থাকত তাহলে সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করে অনগ্রসর শ্রেণী অবশ্যই উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতা বর্তমানে এমনই বিপর্যস্ত যে দেশ জুড়ে আজ লক্ষ-লক্ষ বেকারের ভিড় এবং প্রতিদিনই এই ভিড়ের আয়তন বাড়ছে। বস্তুত, এই কথাটা মনে রাখলে তরুণদের সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলনকে যাঁরা কটাক্ষ বা উপেক্ষা করেছেন অথবা যাঁরা একে অভিহিত করেছেন স্বার্থসচেতন উচ্চবর্ণের উদ্ধত প্রত্যাঘাত রূপে, তাঁরা, বোধ করি, নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে তরুণরা আন্দোলন করেছিলেন উচ্চবর্ণের আধিপত্য বা তথাকথিত আভিজাত্যে ঘা লাগার কারণে নয়। তীব্র বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত দিশেহারা হয়েছিলেন এবং বিপন্ন বোধ করেছিলেন বলেই তাঁরা আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং কেউ-কেউ আত্মাহুতি দিয়েছিলেন; তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে সংসারে সকলের ক্ষুধা নিবারণের মতো খাদ্য যদি মজুদ না থাকে এবং এতৎসত্ত্বেও যদি পরিবারের সদস্যদের কাউকে-কাউকে আলাদাভাবে পেটভরে খাইয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অন্যদের অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকতে হবে।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াও হয় যে ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অসামান্য দক্ষতায় ভারতীয় অর্থনীতিতে আচরেই জোয়ার দেখা দেবে এবং পরিণামে তৈরি হবে লক্ষ-লক্ষ নতুন চাকুরি, তাহলেও এমন ভরসা করা যায় না যে এই অনুকূল পরিস্থিতিতে দেশের অনগ্রসর মানুষেরা সংরক্ষণের সুফল ভোগ করবে। কারণ সংরক্ষণের মাধ্যমে অনগ্রসর শ্রেণীর হাতে চাকুরি তুলে দিতে চাইলেও তাঁদের অতি সামান্য অংশই এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন, যেহেতু অনগ্রসর শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই চাকুরির লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই।

কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের যে তরুণ-তরুণীদের আমরা উচ্চশিক্ষা নিতে দেখি তাঁদের অধিকাংশই অনগ্রসর শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি নন, এঁরা সাধারণত আসেন সেইসব পরিবার থেকে যাঁরা তফসিলি জাতি ও উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হলেও যথেষ্ট আলোকপ্রাপ্ত, সম্পন্ন ও প্রাগ্রসর। সংরক্ষণের পরিধি যত বাড়ানো হবে ততই লাভবান হবেন এই এলিটগোষ্ঠী, কিন্তু প্রকৃতার্থে যাঁরা অনগ্রসর তাঁরা শিক্ষার অভাবে, চেতনার অভাবে এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকবেন।

অবশ্য দেশে শিক্ষার সুযোগ এখন অনেক বেড়েছে এবং অনগ্রসর শ্রেণীর পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণে বাহ্যত কোনো বাধা নেই। বস্তুত, যেখানে দরিদ্র, অনগ্রসর মানুষের ভিড় বেশি সেই গ্রামাঞ্চলে এখন অনেক স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা একটা স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক এবং তফসিলি জাতি-উপজাতির শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি অনুদানেরও ব্যবস্থা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে অনগ্রসর শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে সব প্রতিবন্ধকতাই এখন অপসারিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিষম বাধা একটা আছে এবং সে বাধা আসে অন্য দিক থেকে। মনে রাখতে হবে যে চরম দারিদ্র্যই হল অনগ্রসর শ্রেণীর প্রধান শত্রু, স্বভাবতই পরিবারের সকলের অন্নসংস্থানই হল তাঁদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা যায় যে এ ব্যাপারে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর শ্রম যথেষ্ট নয়। কাজেই পরিবারের সকলকেই কোনো-না-কোনো কায়িক শ্রমের কাজে লাগিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে নেহাত বেঁচে থাকার তাগিদে। এই জন্যই দেখা যায় যে দরিদ্র, অনগ্রসর পরিবারের ছেলেমেয়েরা এখন বহুল হারে স্কুলশিক্ষা নিতে শুরু করলেও এদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলশিক্ষাকে বিদায় জানিয়ে পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য যোগ দেয় কঠোর জীবনসংগ্রামে।

সমস্যা আছে অন্য দিকেও। ধরা যাক অনগ্রসর পরিবারের একটি ছেলে যথোপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে এবং সংরক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করে একটি চাকুরি পেল। কিন্তু এই চাকুরির মাধ্যমে সেই পরিবারের সামগ্রিকভাবে কোনো উন্নতি ঘটবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ সাধারণত দেখা যায় যে তথাকথিত নীচুতলার পরিবারে জাত কোনো ব্যক্তি যখন শিক্ষিত চাকুরিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ তখন তার এক আশ্চর্যজনক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মননে, রুচিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সে তখন নিজেকে উঁচুতলার তথাকথিত ভদ্রলোক বলে ভাবতে শুরু করে এবং উচ্চশ্রেণীর সারিতে ঠাঁই পাবার ব্যাকুলতায় নিজের শ্রেণী, এমনকী নিজের পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যাগ করে। আসল কথা হল এই যে দান করে বা ভিক্ষা দিয়ে যেমন চিরকালের জন্য দরিদ্রের দুঃখ মোচন করা যায় না, তেমনই সংরক্ষণের সাযুজ্যে চাকুরি দিয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর স্থায়ী উন্নতি সাধনের চেষ্টাও নিরর্থক। দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের কর্তা-ব্যক্তিরা এই সরল সত্যটি কখনই মনে রাখেন না। তাঁরা আরও মনে রাখেন না যে ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী শাসক ক্রমবর্ধমান বিপুলসংখ্যক মধ্যবিত্তশ্রেণীর রক্তে অতি সুকৌশলে চাকুরিমনস্কতা ঢুকিয়ে দিয়ে এবং যাঁদের তথাকথিত ভদ্রলোক তৈরি করে দিয়ে কীভাবে ধীরে-ধীরে হত্যা করেছিল তাঁদের স্বনির্ভর ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সমস্ত ইচ্ছা ও সংকল্পকে। এর ফলে আমাদের সমগ্র জাতির কী সর্বনাশ হয়ে গেছে সে কথাটা আমরা আজ সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারি যখন দেখি যে স্বাধীন ভারতবর্ষের চাকুরিজীবীশ্রেণী আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, অলস, কর্মবিমুখ ও ভীরু, এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতার হার বৃদ্ধির জরুরি কাজে যাঁদের কার্যত কোনো আগ্রহ বা ভূমিকা নেই।

চার

এই আলোচনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তটি অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হল এই যে চাকুরি দিয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণ সাধনের প্রয়াস নিতান্ত নিরর্থক। যে দুর্ভাগা দেশে চাকুরি এক দুর্লভ বস্তু সেখানে চাকুরি সংক্রান্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর মন ভোলানোর চেষ্টা প্রতারণারই নামান্তর। চাকুরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত হবে তখনই যখন উন্নত অর্থনীতি চাকুরির ক্ষেত্রে বিপুল প্রসার ঘটিয়ে ভয়াবহ বেকারসমস্যার মোকাবিলায় সক্ষম হবে। এখন তাই সংরক্ষণ নয়, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমবণ্টন। তবে যেহেতু জনগোষ্ঠীর এক বিপুল অংশ অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিচারে অনেক পিছনে পড়ে আছেন, সে কারণে আন্তরিকভাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তাঁদের এগিয়ে নিয়ে এসে সকলের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড় করাতে না পারলে সমবণ্টনের কথা বলাও অর্থহীন। কাজেই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূরীকরণ অর্থাৎ দারিদ্র্যমোচনই আমাদের সামনে আজ প্রাথমিক কাজ। এই কাজ শুরু করার আগে মনে রাখা দরকার যে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের সেখান থেকে স্থানান্তরিত করার কোনো চেষ্টাই হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। অর্থাৎ, অনগ্রসরতা দূরীকরণের প্রাথমিক শর্ত হল এই যে, দরিদ্র, অনগ্রসর মানুষ যে বৃত্তি, পেশা বা কর্মে নিযুক্ত তাঁর কাছে উদার সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সেখানেই। তাঁকে সুরক্ষা দিতে হবে সামাজিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দিতে হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, পুঁজি, কাঁচামাল ও দরকারি যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থা করতে হবে তাঁর উৎপন্ন দ্রব্য বিপণনের এবং সুনিশ্চিত করতে হবে তাঁর সামাজিক নিরাপত্তা। এসব কিছুর লক্ষ্য হবে তাঁকে স্বনির্ভর ও নিজ কর্মশক্তিতে বলীয়ান করে তোলা। এজন্য প্রয়োজন এক ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মযজ্ঞের। অবশ্য এই কর্মযজ্ঞ সফল করে তুলতে হলে দেশবাসীর সম্পন্ন ও প্রাগ্রসর অংশের পক্ষ থেকে কিছু ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন। বিত্তশালী গোষ্ঠী স্বেচ্ছায় এই ত্যাগে প্রস্তুত থাকবেন, এই প্রত্যাশা অবাস্তব। এই জন্যই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে। কীভাবে এই কাজ শুরু করা হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হতে পারে এইরকম :

(এক) সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে যে দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর মানুষদের স্বনির্ভর ও উন্নত করে তোলার জন্য এক বহুমুখী, বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প প্রবর্তন করা হবে।

(দুই) এই প্রকল্পের সাধারণ তত্ত্বাবধানের জন্য থাকবে একটি স্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক ও পরামর্শদাতা কমিটি যাতে সদস্য হিসাবে থাকবেন প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রতিনিধি।

(তিন) দেশের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজসেবীদের সহায়তায় প্রণীত হবে এক বিস্তারিত পরিকল্পনা।

(চার) এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রশাসনের সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র একটি দপ্তর খোলা হবে এবং এই দপ্তরে কর্মী হিসাবে গ্রহণ করা হবে তাঁদের যাঁদের মননে, চিন্তায় ও কাজকর্মে দেশাহিতৈষণা ও পরার্থপরতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(পাঁচ) বাজেটের পনেরো শতাংশ অর্থ স্থায়ীভাবে বরাদ্দ হবে এই প্রকল্প কার্যকর করার জন্য। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র কর আরোপের স্বাধীনতা থাকবে সরকারের।

(ছয়) আইন প্রণয়ন করে এই বিধিনিষেধ কঠোরভাবে আরোপ করা হবে যে শাসক দল সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে, নির্বাচনী ইশতাহারে, প্রচারাভিযানে অথবা অন্য যে কোনো জায়গায় কোনোভাবেই অনগ্রসরতা দূরীকরণ প্রকল্পের জন্য স্বতন্ত্র কৃতিত্ব দাবি করবে না।

উপসাগরীয় যুদ্ধের জর্নাল

অন্নদাশঙ্কর রায়

এই যুদ্ধ

এই যুদ্ধ থামবে কি? কুয়েত উদ্ধার
শেষকথা নয় এর। আছে আরো কথা
উপসাগরীয় তৈলভোগের ক্ষমতা
লক্ষ্য এই দ্বিপাক্ষিক বলপরীক্ষার।

রাইন নদের স্বর্ণ সেকালের লক্ষ্য
জার্মান গাথায় তার পরিণাম ধ্বংস
সে সোনা হারিয়ে যায়, মেলে নাকো অংশ
তৈল এ যুগের স্বর্ণ, হারাব দু'পক্ষ।

আরো এক কথা হল ফিলিস্তিনি মুক্তি
এই যুদ্ধে গ্রন্থিবদ্ধ তার ভবিতব্য
নতুবা পুনরাবৃত্তি এর ঘটিতব্য
ইহুদী আরব যদি না-ই মানে যুক্তি।

নীরব দর্শক আমি। কবির মন্ত্রণা
শুনেছে কোথায় কবে বলদর্পী জনা?

যুদ্ধোত্তর পর্ব

এই যুদ্ধ থেমে গেল সহসা অকালে
অতিহিংসা জয়ী হল হিংসার উপরে
কুয়েত বিমুক্ত হল অসম সমরে
ইরাক সে চালমাত আপনার চালে।

কে কারে শেখাবে ন্যায়, কে বা কারে নীতি?
মানুষের প্রাণ কোনো মূল্য নাই তার
আবাল বনিতা বৃদ্ধ বোমার শিকার।
মনোবল ভঙ্গ করে নির্বংশতা ভীতি।

স্তম্ভিত নির্বাক দশা বিশ্বমানবের
স্পর্ধিত অমানবিক প্রযুক্তিপ্রয়োগে
সুমের ও ব্যাবিলন লাঞ্ছনায় ভোগে
মেরুদণ্ড বক্র হল সর্ব আরবের।

তৈলস্বর্ণ জেতাদের, এটাই নিশ্চিত
ফিলিস্তিনি মুক্তি? তার শুধুই ইঙ্গিত।

আমার কম্বল ফিরে দাও

আনন্দ ঘোষ হাজরা

আশ্চর্য কম্বল তুমি শরীরে জড়িয়ে উড়ে চলে গেলে
নক্ষত্রের দিকে···
পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে কোনো নীহারিকা, সপ্তর্ষির কাছে;
যেন তুমি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলে এতদিন
পাখা মেলে উজ্জ্বল আলোকে উড়ে গেলে।

অথচ রাত্রি কি জানে? তারাদল জানে?
ও কার কম্বল তুমি জড়ালে শরীরে?

আমার কম্বল ফিরে দাও, আমি কুৎসিত ধুলোয়
স্বপ্ন মেখে প'ড়ে আছি, ঘন অন্ধকার—
আমার কম্বল তুমি নিলে কেন, আমি তো দিই নি
ফিরে দাও, আমার কম্বল ফিরে দাও।

পৃথিবীর হাঁ-মুখে কখন এসে নেমে গেছি গুহার ভিতরে
কেবল জঞ্জাল, ধুলো, সাপ আর গরম নিঃশ্বাস
আমার ঘাড়ের কাছে খেলা করে; দ্যাখো
তবু আমি স্বপ্নময়; আমার কম্বল ফিরে দাও···

আশ্চর্য কম্বল তুমি শরীরে জড়িয়ে উড়ে চলে গেলে
নক্ষত্রের দিকে।

স্মৃতিবাহিত

সুকুমার চৌধুরী

লু-বাতাসে হাঁটতে-হাঁটতে এখন আর তোমাকে দেখি না
তোমার সঙ্গিনীদের সাথে মাঝে-মাঝে দেখা হয়
তেমনি থমকে থাকে প্রিয় সাদা বাড়ি
স্টেশনে অর্জুনগাছে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালে
এখনো ঝুকঝুক করে হেঁটে আসে নীল ট্রেন

এখনো দুপুরবেলা আমার প্রতীক্ষা কেঁপে ওঠে
আমার মনখারাপ হয়ে যায়, ভালো লাগে না
ভোরের বাতাসে মেয়েরা ফুল কুড়োতে আসে
তার মাঝে তোমাকে দেখি না আর
মেরুন রঙের শাড়ি, নতমুখ, প্রশান্ত ভ্রূকুটি

অথচ তোমার কাছে কিছুই গচ্ছিত নেই আর
স্মৃতিমেদুর পথঘাট, বেড়া ও প্রাচীর, মৃদু ঘুলঘুলি
তবুও অচিন দ্বীপে নিজেকে মানিয়ে নাও
মেনে নাও ভবিতব্য ঘরগেরস্থালি

আসলে কিছুই নয়, তুমি আমি সকলেই জানি
অনিবার্যতার কাছে আজো ক্রীড়নক রয়ে গেছি
আমরা সকলে, মুখ ফুটে হয়তো বলি না

অভিযাত্রীর গান

উজ্জ্বল সিংহ

আমার নির্ঘুম রাত্রি আরো দীর্ঘ হোক
আরো দীর্ঘ হোক আমার অবসন্ন দিন,
ব্যাকটিরিয়া-দষ্ট ওই বিষণ্ণ মলিন
শরীরকে ঘিরে থাক সূচীতীক্ষ্ণ শোক।

চলিষ্ণু দুপায়ে যদি স্থবিরতা এসে
বাসা বাঁধে, আরো দ্রুত উচ্চে উঠে যাব
ভারক্লান্ত মাথা তুলে শরীর ঝাঁকাব
উঠে যাব হিম স্যাক্সিফ্রেজের দেশে।

ফ্রস্টবাইটের বিষে খসে পড়ল নাকি
আমার আঙুল কোনো অবশ দুপুরে ?
প্রাণবন্ত হয়ে তবু সব চূড়া ঘুরে
ফিরে আসব শূন্য ক্যাম্পে সম্পূর্ণ একাকী।

গোরস্থানের কঙ্কাল

ইনাস উদ্দীন

গোরস্থান হতে এক কঙ্কাল উঠে এল
বলল, 'আমি যুদ্ধ করব।'
আমি রক্তমাংসের বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ
প্রচুর অস্ত্র আমার হাতে, তবু
কঙ্কাল বলে, 'আমি যুদ্ধ করব।'
নীতিজ্ঞানহীন অশরীরী কঙ্কাল
নিয়ম মানে না যুদ্ধের—
রক্ত ঝরে না, ক্লান্ত হয় না, আছাড়ে মরে না কঙ্কাল।

রণক্ষেত্রে বিধ্বস্ত ঘর্মাক্ত একাকী সৈনিক
বৃথাই খুঁজে চলি কঙ্কালবধের অস্ত্র
আচমকা বারে-বারে উঠে আসে কঙ্কাল
বলে, 'আমি যুদ্ধ করব।'

ড. বি আর আম্বেদকর, ভারতের পশ্চাৎপদ মানুষ ও মণ্ডল কমিশন

দেবী চ্যাটার্জি

অগস্ট মাস, ১৯৯০। কেন্দ্রীয় সরকার এক বিস্ফোরক ঘোষণা করলেন—মণ্ডল কমিশনের সুপারিশক্রমে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে ২৭ শতাংশ পদ সংরক্ষিত হবে।

ঘোষণাটি করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ দৈনিক সংবাদপত্র মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের বিরুদ্ধতা করল। সরকারি ঘোষণাটির আগে পর্যন্ত কিন্তু মণ্ডল কমিশন বা তার সুপারিশ নিয়ে সংবাদ-পত্রগুলির বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। জাতীয় মোর্চার নির্বাচনী ইস্তাহারে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতেই সরকারি ঘোষণাটি করা হয়। অথচ, ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে নানা দিকে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। জাতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মণ্ডল-কমিশন-পন্থী ও মণ্ডল-কমিশন-বিরোধী-দের গোষ্ঠী গড়ে উঠল এবং ভাঙন এড়াতে দক্ষিণপন্থী বামপন্থী, তথা নানা-পন্থী দলগুলি নানা ধরনের শব্দের মারপ্যাঁচ শুরু করে দিল। কখনও শোনা যায়, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশই ভুল; কেউ বা বলেন—দশ বছরের পুরানো সুপারিশ; ফলে আবার সবকিছু নতুন করে ভাবা উচিত; কারো বা মতে সুপারিশ কার্যকর করার সময়নির্বাচনে ভুল হয়েছে; আবার কেউ-কেউ বা বললেন—সুপারিশও ভুল নয়, সুপারিশ রূপায়ণের সময়নির্বাচনও ভুল নয়, ভুলটা হল সুপারিশ কার্যকর করার পদ্ধতিটায়।

উপস্থাপন করার পদ্ধতিটা যাই হোক না কেন, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, সব বক্তব্যের সারমর্ম একটিই—সেটি হল যেন তেন প্রকারে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা ঠেকাতে হবে।

এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্ত কিছু ছাত্র পথে নামল, এমনকী আত্মাহুতির ঘটনাদির কথাও শোনা গেল।

উত্তেজনার চরম পর্যায়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটল। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ

কার্যকর করতে যাওয়া এ পতনের একমাত্র কারণ না হলেও যে অন্যতম প্রধান কারণ, সে-বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন ওঠে—মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে কী এমন ছিল যার জন্য এই-পরিমাণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ভারতের সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করতে হয়; জানতে হয় কেন সংবিধানপ্রণেতা, দলিত নেতা ড. বি আর আম্বেদকরকে বলতে হয়েছিল :

Who can say that the untouchable is not right in saying that he will not trust the Hindu? The Hindu is as alien to him as a European is and, what is worse, the European alien is neutral but the Hindu is most shamefully partial to his own class and antagonistic to the untouchable.[১]

২

হাজার-হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা জাতব্যবস্থা ভারতবর্ষের সমাজজীবনের এক নিষ্ঠুর বাস্তব। চতুর্বর্ণ নয়, আজ ভারতবর্ষে কয়েক শত জাত ধাপে-ধাপে সাজানো—একটার উপর আর-একটা। জাত-গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বৈষম্য, বিতৃষ্ণা আর অবিশ্বাসের উপর গড়া। তথাকথিত নীচু জাতের মানুষদের তথাকথিত উঁচু জাতের মানুষদের অবজ্ঞার বোঝা দেবতার বিধান বলে অবিরত বয়ে বেড়াতে হয়। হিন্দুধর্ম এই বৈষম্যব্যবস্থাকে তার অনুমোদন দেয়; ঘোষণা করে—ব্রাহ্মণের সেবার জন্যই শূদ্রের জীবনধারণ! শ্রমদান শূদ্রের কর্তব্য, কিন্তু তার নিজের শ্রমের ফসলের উপর তার কোনো অধিকার নেই!

এই অপমানের বোঝা বহু নীচু জাতের মানুষে নীরবে সহ্য করলেও, সহ্য করতে পারেন নি ড. ভীমরাও আম্বেদকর। অস্পৃশ্য পরিবারের সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করে ভীমরাওকে পদে-পদে তার ধাক্কা খেতে হয়েছে।[২] বাল্যকালে স্কুলের ছাত্র হিসাবে তিনি দেখেছিলেন শিক্ষকরা তাঁকে বোর্ডে লিখতে দিতেন না, পাছে তাঁর ছোঁয়ায় বোর্ড আর খড়ি অপবিত্র হয়ে যায়; ওই একই কারণে তিনি বোর্ডের দিকে এগোলেই সহ-ছাত্ররা ছুটে গিয়ে বোর্ডের পিছনে রাখা টিফিন বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলত।

শিক্ষান্তে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরও তিনি বহুবার বৈষম্যমূলক আচরণের মুখোমুখি হয়েছেন। অস্পৃশ্য ভীমরাওয়ের সংস্পর্শের ভয়ে অধস্তন কর্মচারীরা তাঁর টেবিলে অনেক সময়ই ফাইল ছুঁড়ে দিত। অথচ, বড়োদার মহারাজার আনুকূল্যে তিনি উচ্চশিক্ষালাভের জন্য যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন, তিনি লক্ষ করেছিলেন কেউ তাঁকে পদে-পদে সেখানে স্মরণ করিয়ে দিত না যে তিনি অস্পৃশ্য। সেখানে শ্রেণীশোষণ থাকলেও তা জাত-ভিত্তিক নয়। সেখানে সবার সঙ্গে খোলামেলা ভাবে মেশার সুযোগ ছিল। তিনি তাঁর সহপাঠীদের সমকক্ষ ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও, লনডন, জার্মানি তথা অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রে বসবাস করার আর অধ্যয়ন করার সুযোগ ভীমরাওয়ের জীবনে আসে। ভারতবর্ষের বাইরে সর্বত্রই তিনি তাঁর যোগ্যতা অনুসারে সম্মান পান; দেশে থেকে তিনি যে আচরণ পান নি বিদেশে গিয়ে তিনি তা পান। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক (লিবারল ডেমোক্র্যাটিক) চিন্তাধারা তাঁকে আকৃষ্ট করে। যোগ্যতা যে বংশানুক্রমিক নয়, অর্জিত—পাশ্চাত্যের এই মূল্যবোধ ড. আম্বেদকর উৎসাহ-সহকারে গ্রহণ করেন।

শৈশব থেকেই ভীমরাও একটি ধর্মীয় আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়েছিলেন। পিতার নির্দেশক্রমে প্রতিদিন তাঁকে রামায়ণ-মহাভারতের থেকে কিছু-কিছু অংশ পাঠ করতে হত। ফলে, বাল্যেই তিনি হিন্দু ধর্মীয় উপাখ্যানগুলির সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত

হন। কিন্তু এই পরিচয় মেনে নেওয়াতে রূপান্তরিত হয় না; বরং তাঁর মনে নানা প্রশ্ন উঁকি দেয়। সে-সমস্ত প্রশ্নের তিনি কোনো সদুত্তর খুঁজে পান না। অনেক কিছুই তাঁর কাছে অযৌক্তিক মনে হয়। তাঁর সেদিনের সেই জিজ্ঞাসু মন পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বসে। অর্থাৎ, অজ্ঞতা নিয়ে নয়, হিন্দু তত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীর পাণ্ডিত্যকে তাঁর অন্যতম হাতিয়ার বানিয়ে তিনি তাঁর লড়াইয়ে নামেন। আর, সে পাণ্ডিত্যের বীজ প্রোথিত হয়েছিল তাঁর বাল্যকালে, রামায়ণ-মহাভারত অধ্যয়নের মাধ্যমে।

বাল্যকালে ঠিক যে সময়ে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ভীমরাওয়ের মনে নানা প্রশ্ন জেগে উঠছিল, সেই সময়ে তিনি গৌতম বুদ্ধের একটি জীবনীগ্রন্থ হাতে পান। এটি তাঁর সামনে চিন্তাধারার ভিন্ন একটি দ্বার উন্মুক্ত করে। ক্রমে, বৌদ্ধধর্ম তাঁর চোখে হিন্দুবাদের বিকল্প হিসাবে স্থান পায়।

হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট মারাঠি নেতা জ্যোতিরাও ফুলে নিঃসন্দেহে ড. আম্বেদকরের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য প্রেরণা ছিলেন। জাতব্যবস্থার অসাম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে ১৮৭৩ সালে ফুলে "সত্যশোধক সমাজ" স্থাপন করেন। দ্বিধাহীন ভাষায় ফুলে শাস্ত্র-গুলিকে শ্রেণীশোষণের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেন। জ্যোতিরাওয়ের সংগ্রামী জীবন ও অবদমিত জাতদের সংগঠিত করার প্রয়াস ড. আম্বেদকরকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি জ্যোতিরাওয়ের গড়ে তোলা সামাজিক আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তত্ত্ব দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, অবদমিত জাতের মানুষদের নানাবিধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ড. আম্বেদকর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে তৎপর হন।

৩

স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্যদের অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে, সে সম্পর্কে ড. আম্বেদকরের গভীর উদ্বেগ ছিল। ইংরেজ রাজার জায়গায় বর্ণহিন্দুরাজ কায়েম হলে নীচু জাতের মানুষের যে নিতান্তই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে, সে বিষয়ে ড. আম্বেদকরের সন্দেহ ছিল না। তাই, অবদমিত জাতের নেতা হিসাবে তিনি যখন স্বীকৃতি লাভ করলেন, তখন তাদের জন্য বিশেষ সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধার দাবি তুললেন।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে, ভারতের সংবিধান রচনার বিষয়টি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ১৯৩১-এ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে অবদমিত জাতগুলির প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য ড. আম্বেদকর আমন্ত্রণ পান। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ক্ষমতার অংশ দাবি করেন। অবদমিত জাতদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দাবি করে তিনি সংখ্যালঘু কমিটির কাছে একটি দাবি-সনদ পেশ করেন। মুসলমান, খ্রীষ্টান, অবদমিত জাত ও ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে সংখ্যালঘু কমিটির সামনে একটি দাবিপত্র তুলে ধরেন। এটি সংখ্যালঘু চুক্তি নামে পরিচিতি পায়।[৩]

গান্ধীজী কিন্তু এই সংখ্যালঘু চুক্তির ফলে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ড. আম্বেদকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তিনি বলেন যে, নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে ড. আম্বেদকরের বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। গান্ধীজী এ-ও বলেন যে, অস্পৃশ্যদের ধর্মান্তরিত হওয়া নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবির তিনি ঘোরতর বিরোধী।

গান্ধী অস্পৃশ্যদের পৃথক রাজনৈতিক অধিকারের বিরোধী হলেও, ১৯৩২-এর ১৭ই অগস্টের সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারায় তা স্বীকৃত হয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণা অনুযায়ী অবদমিত শ্রেণীদের একটি পৃথক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করা হয়, আর তার ফলে তারা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে পারে। এক দিকে এদের জন্য আলাদা সংরক্ষিত নির্বাচনী এলাকার ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়; অপর দিকে, সাধারণ আসনগুলি থেকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার বজায় থাকে।

গান্ধীজী এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না। তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানালেন, জীবন পণ করে তিনি অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে প্রতিরোধ করবেন। তিনি আ-মরণ অনশন করার হুমকি দিলেন। সে হুমকিতে যখন কোনো ফল হল না, তখন তিনি প্রকৃতই অনশন শুরু করে দিলেন।

জওহরলাল নেহেরুর মতো কংগ্রেসি নেতাও গান্ধীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসূত এই প্রশ্নটিকে নিয়ে মাতামাতি করাকে ভালো চোখে দেখেন নি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন :

I felt annoyed with him (Gandhi) for choosing a side issue for his final sacrifice. What would be the result of our freedom movement? Would not the larger issues fade into the background for the time being at least?···

I felt angry with him at his religious and sentimental approach to a political question, and his frequent references to God in connection with it. He even seemed to suggest that God had indicated the very date of the fast. What a terrible example to set.[৪]

অর্থাৎ, 'একটি পার্শ্ববর্তী বিষয়কে কেন্দ্র করে তাঁর সর্বশেষ আত্মত্যাগ করাতে আমি বিরক্ত বোধ করেছিলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের ফল কী হবে? সাময়িকভাবে হলেও, মূল বিষয়গুলি কি পিছনে চাপা পড়ে যাবে না?···একটি রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মীয় ও আবেগপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করায় আর বারংবার এই প্রসঙ্গে ভগবানের উল্লেখ করায় আমার গান্ধীর উপর রাগ হয়। অনশন শুরু করার তারিখটিও যেন ভগবান তাঁকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এটি অন্যদের দেওয়ার কী সাংঘাতিক একটি উদাহরণ।'

যাই হোক, গান্ধীজীর অনশন সেদিন একটি অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিবর্তনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না; তবুও মেনে নেয় যে, বর্ণহিন্দু আর অস্পৃশ্যরা যদি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিবর্তন করার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে কোনো সমঝোতায় পৌঁছোতে পারে, তা হলে সরকার সেই পরিবর্তিত ফরমুলা গ্রহণ করবে। এ অবস্থায় খুব স্বাভাবিকভাবেই সকলে ড. আম্বেদকরের দিকে তাকান, কারণ তাঁর অনুমোদন ছাড়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কোনোভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। সেদিন, অত্যন্ত অযৌক্তিক এক ধরনের চাপের মুখে দাঁড়িয়ে গান্ধীজীকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচানোর মানবিকতার দাবিকে মেনে নিয়ে, ড. আম্বেদকর পুনা চুক্তির শর্তাবলী মেনে নিতে রাজি হন।[৫] কারণ, এই পুনা চুক্তি গান্ধীজীর কাছে গ্রহণীয় ছিল।

আপাতদৃষ্টিতে পুনা চুক্তিটি অস্পৃশ্যদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল না। চুক্তিটির ফলে তাঁরা ১৪৮টি আসন পাচ্ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা তাঁদের মাত্র ৭৮টি আসন দিচ্ছিল। তবে, আরো একটু ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যায় যে, পুনা চুক্তির ফলে অস্পৃশ্যরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় দেওয়া সেই দ্বিতীয় ভোটের অধিকারটি হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় সেই ভোটটি কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ

ছিল। ভোটটি হারানোর ফলে যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয় ক্ষতি। ৭৮টি আসনের পরিবর্তে ১৪৮টি আসন লাভ করলে সে ক্ষতিপূরণ হয় না। ড. আম্বেদকর কারণটি বুঝিয়ে বলেন :

'The second vote given by the Communal Award was a priceless privilege. Its value as a political weapon was beyond reckoning. The voting strength of the untouchables in each constituency is one to ten. With this voting strength free to be used in the election of caste Hindu candidates, the untouchables would have been in a position to determine, if not dictate, the issue of the General Election. No caste Hindu candidate could have dared to neglect the untouchable in his constituency or be hostile to their interest if he was made dependent upon the votes of the untouchables. Today the untouchables have a few more seats than were given to them by the Communal Award. But this is all that they have. Every other member is indifferent, if not hostile. If the Communal Award with its system of double voting had remained the untouchables would have had a few seats less but every other member would have been a member of the untouchables...'[৬]

অর্থাৎ, ড. আম্বেদকর স্মরণ করিয়ে দেন যে, দ্বিতীয় ভোটটি রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। ওই দ্বিতীয় ভোটের সাহায্যে অস্পৃশ্যদের পক্ষে সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবিত করা সম্ভব ছিল, কোনো বর্ণহিন্দু প্রার্থীই অস্পৃশ্যদের দাবি অগ্রাহ্য করার সাহস পেতেন না। তাই, যদিও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে অস্পৃশ্যরা আসন-সংখ্যা কয়েকটি কম পেতেন, প্রত্যেক সদস্যই হতেন তাঁদের সদস্য। পুনা চুক্তির ফলে অস্পৃশ্যদের এই অধিকার হারাতে হয়।

অর্থাৎ, সবকিছু জেনে, বুঝে, তীব্র ক্ষোভ সত্ত্বেও সেদিন ড. আম্বেদকরকে পুনা চুক্তির শর্তগুলি মেনে নিতে হয়েছিল। তবে, অস্পৃশ্য মানুষদের দাবিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংগ্রাম থেকে তিনি বিরত হন নি।

ভারতে হিন্দুরাজ কায়েম হওয়ার ব্যাপারে ড. আম্বেদকর তাঁর সন্দেহের কথা সবিস্তারে ১৯৪২-এ ক্রিপস মিশনের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি দাবি তোলেন যে, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্রিটিশ সরকার আর গণপরিষদের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছিল সেই চুক্তিতে অবদমিত শ্রেণীদের সংখ্যালঘু হিসাবে গণ্য করা হোক।[৭]

ড. আম্বেদকর ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের কাছেও তফশিলি জাথতদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি তোলেন। তাদের জন্য বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি করেন। এ ছাড়াও, তফশিলি জাতদের জন্য বিধানসভাগুলিতে, সরকারি পদে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব চাওয়া হয়।

বঙ্গদেশের বিধানসভা দ্বারা নির্বাচিত হয়ে ড. আম্বেদকর গণপরিষদের সদস্যপদ লাভ করেন। পরবর্তী কালে সংবিধানের খসড়া কমিটির সদস্য, আর তারও পরে সভাপতি নিযুক্ত হন। ড. আম্বেদকর তাঁর গণপরিষদে যোগদান প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি কেবলমাত্র তফশিলি জাতদের স্বার্থ রক্ষা করতেই পদটি গ্রহণ করেছিলেন।[৮] প্রকৃতপক্ষেই তিনি গণপরিষদে পদে-পদে অবদমিত জাতগুলির স্বার্থ রক্ষা করে যাওয়ার প্রয়াস চালান। আর তাঁর সেই অনলস চেষ্টার ফলেই ভারতীয় সংবিধানে অবদমিত জাতের মানুষদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪

গণপরিষদে বিতর্ককালে ড. আম্বেদকর স্মরণ করিয়ে

দিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক গণতন্ত্র সামাজিক গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তা কখনও স্থায়িত্ব লাভ করে না। 'সামাজিক গণতন্ত্র কী?' সে প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. আম্বেদকর বলেন যে, তা এমন একটি জীবনধারাকে বোঝায় যাতে স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের নীতিগুলি জীবনাদর্শ হিসাবে স্বীকৃত। এই নীতিগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করলে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য পরাজিত হয়। ড. আম্বেদকর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই তিনটি নীতির মধ্যে দুইটি নীতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই দুইটির একটি হল সাম্য; দ্বিতীয়টি হল ভ্রাতৃত্ব। ভারতবর্ষে এমন একটি সমাজব্যবস্থা বর্তমান যেখানে অসাম্যের নীতি অনুসৃত; সামাজিকভাবে কিছু মানুষ উপরে, কিছু নীচে অবস্থিত। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে, কারো সম্পদের প্রাচুর্য আছে, কারো বা চরম দারিদ্র্য।

ড. আম্বেদকর কখনোই মনে করেন নি এহেন ভারতীয়রা একটি জাতি গঠন করে। 'How can people divided in several thousands of castes be a nation?' তিনি জানতে চান। অর্থাৎ, কয়েক হাজার জাতে (caste) বিভক্ত যে জনসাধারণ তাদের পক্ষে কী করে একটি জাতি গঠন করা সম্ভব? জাত (caste)-গুলিকে ড. আম্বেদকর জাতীয়তা-বিরোধী বা anti-national বলে অভিহিত করেন কারণ তারা একদিকে সমাজজীবনে বিভেদ সৃষ্টি করে অপর দিকে জাতে-জাতে ঈর্ষা আর বিদ্বেষ সঞ্চার করে।[৯]

এই পরিস্থিতিতে ড. আম্বেদকর স্বাভাবিকভাবেই মনে করেন যে, অস্পৃশ্যদের স্বার্থ রক্ষা করার একমাত্র পন্থা হল ভারতীয় সংবিধানে তাদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৮ ও ১৯শে জুলাই ১৯৪২ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত All India Scheduled Castes Conference-এ গৃহীত প্রস্তাবের দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের কোনো সংবিধানই তফশিলি জাতদের কাছে গ্রহণীয় হবে না, যদি না তা তফশিলি জাতদের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি না তাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক এক গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য করে এবং যদি না তাতে তফশিলি জাতদের যথার্থ নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।[১০]

এই নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। অন্যান্য দাবির সঙ্গে তপশিলি জাতভুক্তদের জন্য আইনসভাগুলিতে আর সরকারি চাকুরিতে সংরক্ষিত আসনের দাবি করা হয়। পরবর্তী কালে ড. আম্বেদকর গণপরিষদে মূলত এই দাবিগুলিই উত্থাপন করেন ও কার্যকর করার জন্য সচেষ্ট হন।

৫

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় দুর্বলতর মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হয়েছে—

> The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people...[১১]

সংবিধানের এই ধারা অনুসারে রাষ্ট্র বিশেষ যত্ন-সহকারে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবে।

অন্যত্র, মৌলিক অধিকারের ১৬(৪) ধারায় তফশিলি-জাত জনজাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী-দের জন্য চাকুরি-ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবি স্বীকৃত হয়। তফশিলভুক্তদের জন্য সংসদে বিধান-সভায় নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য আসন-সংরক্ষণ, তফশিলি জাত / জনজাতির বিষয়ে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জন্য কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা

প্রভৃতি বিবিধ ধারা সংবিধানে স্থান পায়।[১২]

দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংবিধানে তফশিলি জাত / জনজাতি ছাড়াও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উল্লেখ আছে। ৩৪০ নং ধারাবলে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী নির্ণয়ে জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি কমিশন গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই কমিশনই স্থির করবে অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী কারা আর তাদের জন্য কী কী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৩৪০ ধারাটি নিয়রূপ—

340(1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any state to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any state and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.

(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.[১৩]

সংবিধানের এই ধারা অনুসারেই ১৯৫৩ সালে প্রথম অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর কমিশনটি গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন কাকা কালেলকর। তাঁর নামেই কমিশনটি পরিচিত। ব্যাপক আকারে অনুসন্ধান চালিয়ে কাকা কালেলকর কমিশন শিক্ষাগত ও সামাজিক পশ্চাৎপদতাকে জাতব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কমিশন 'পশ্চাৎপদ' ও 'বিশেষভাবে পশ্চাৎ-পদ' শ্রেণীদের তালিকা প্রস্তুত করে ১৯৫৫-তে তার রিপোর্টটি পেশ করে।[১৪]

কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু সেদিন জাতকে পশ্চাৎ-পদতার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হয় নি। ফলে, কাকা কালেলকর কমিশনের সুপারিশও কার্যকর হয় নি। বলা হয়, বিষয়টি নিয়ে আরো গভীরভাবে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন আছে। সেই বিচার-বিবেচনার ফল কেন্দ্রীয় স্তরে আমরা তেমন কিছু দেখতে পাই নি। বরং আমরা দেখলাম, পশ্চাৎ-পদতার বিষয়টিকে অনেকাংশে রাজ্যগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। রাজ্যগুলি তাদের নিজের-নিজের মতন বিষয়টিকে দেখল ও সিদ্ধান্ত নিল। অর্থাৎ, কোথাও পশ্চাৎপদদের তালিকা তৈরি হল, কোথাও বা হল না; যেখানে-যেখানে হল সেখানে-সেখানে তার ভিত্তি এক হল না।

বহু বছর পর, ১৯৭৮ সালে কেন্দ্রীয় স্তরে পশ্চাৎ-পদতার বিষয়টিকে নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করা হয়। দ্বিতীয় পশ্চাৎপদ শ্রেণী সংক্রান্ত কমিশনটি গঠিত হয়। বি. পি. মণ্ডল কমিশনটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৮৩-এ এই মণ্ডল কমিশন তার রিপোর্ট জমা দেয়।[১৫] সামাজিক, অর্থনৈতিক আর শিক্ষাগত মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে মণ্ডল কমিশন জাতকে পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে মেনে নেয়। আবারও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত হয়। কিন্তু এবারেও দেখা গেল কমিশনের সুপারিশের উপর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না—অন্তত দশ বছরের ধরে।

১৯৮৯-এ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের পরিবর্তন

ঘটে, আর ১৯৯০-এ ভি. পি. সিং সরকার মণ্ডল কমিশনের রায়, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিক্রমে, কার্যকর করার কথা ঘোষণা করেন। তার পরই কয়েক মাসের মধ্যে একের পর এক নানা ঘটনা দ্রুত তালে ঘটে চলে—যে-সমস্ত ঘটনাদির উল্লেখ নিবন্ধের শুরুতেই করেছি। উত্তেজনার তুঙ্গে সরকারের পতন ঘটে। এর ফলে সাময়িকভাবে বিতর্ক কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও তার অবসান ঘটে না। সরকারের উপর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন আর সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিটা থেকেই যায়।

৬

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, ১৯৫১ সালে State of Madras vs Champakam Dorairajan মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অতিক্রম করে অবদমিত জাতদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আইনসঙ্গত করতে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীটির প্রয়োজন হয়েছিল। সংশোধনীটি সংবিধানের মৌলিক অধিকারের ১৫নং ধারায় ৪নং উপ-ধারাটি যুক্ত করে। এর ফলে ১৫(১) ধারা—'The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them'.-এর পাশাপাশি ১৫(৪)-ধারা যুক্ত হয় 'Nothing in this Article or in clause (2) of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes···'.[১৬]

সংবিধানের এই সংশোধনীটি আলোচনার বিতর্ক-কালে সংসদের সদস্যদের নানা মন্তব্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, ১৫(৪)-এর 'পশ্চাৎপদ শ্রেণী' ৩৪০(১)-এ উল্লিখিত পশ্চাৎপদ শ্রেণীর সমার্থক হওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। আর, এই 'পশ্চাৎপদ শ্রেণী' কথাটি কতকগুলি পশ্চাৎপদ জাতকে নির্দেশ করবে। এটা ড. বি. আর. আম্বেদকরের মন্তব্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়। সংবিধান-প্রণয়নকালে তিনি অবদমিত জাতদের স্বীকৃত নেতা ও গণপরিষদের খশড়া কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, ফলে সংবিধান সংশোধনের সময় তাঁর করা মন্তব্যের একটা আলাদা তাৎপর্য ছিল। প্রথম সংবিধান সংশোধনের আলোচনার বিতর্ককালে তিনি বলেছিলেন :

What are called backward classes are... nothing else but a collection of certain castes.[১৭]

এই মন্তব্যটি করার সময়, অর্থাৎ যখন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীটি আলোচিত হচ্ছে সেই সময়ে ড. আম্বেদকর আইনমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে, এক সময়ের সংবিধানের খশড়া কমিটির চেয়ারম্যান, পরবর্তী কালের প্রথম ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনের সময়ের আইনমন্ত্রী, 'backward classes'-কে 'collection of certain castes' বলায় সংবিধান-রচয়িতাদের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বাকি থাকে জাতগুলিকে নির্ণয় করা। সেই কাজের ভার থাকে অন্যান্য পশ্চাৎ-পদ শ্রেণীর কমিশনের উপর। আমরা দেখেছি, দুই দফে দুটি পশ্চাৎপদ শ্রেণীর কমিশন, ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে, পশ্চাদপদ শ্রেণীদের তালিকা প্রস্তুত করে। কিন্তু, তাদের প্রস্তাবগুলি কার্যকর হওয়ার পথে প্রতিবারই বাধার সৃষ্টি হয়। কখনও সরকার প্রস্তাব মানতে রাজি হয় না, কখনও বা সরকার তা আংশিকভাবে মানতে রাজি থাকলেও জনরোষের ফলে তা সম্ভব হয় না। কেন?

আর-একবার আমরা ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই। ভেবে দেখি, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পুনা চুক্তির কথা; তফশিলি জাত/জনজাতির দাবিগুলি প্রতিষ্ঠিত করার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত যুক্তি তোলা হয়েছিল তার কথা। তফশিলি জাত/জনজাতির সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি প্রতিষ্ঠা করার সময় প্রতিরোধকারীরা যে-সমস্ত যুক্তি তুলেছিল, মণ্ডল সুপারিশের বিরোধীদের যুক্তিও অনেকটা সেই একই সুরের। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরোধকারীরা মুষ্টিমেয় উচ্চ জাতের সদস্য। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে এরা দুর্বল হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ফলে এরা সোচ্চার। এই প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষের পক্ষে ২২'৫ শতাংশ সংরক্ষণ (তফশিলি জাত/জনজাতিদের জন্য) অত্যন্ত অনিচ্ছায় মেনে নেওয়া সম্ভব হলেও, 'অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী'দের দাবি এসে পড়ায় প্রকৃতই ভয়ের কারণ দেখা দিয়েছে। কমিশনের সুপারিশক্রমে, বিচার বিভাগের নির্দেশের কথা মনে রেখে, সরকার অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা করেছিলেন। তাতেই, নীচু জাতদের (তফশিলি জাত/জনজাতি ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণী) হাতে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ (৪৯'৫ শতাংশ) পদের অধিকার চলে যায়। এটাই ১৫ শতাংশ ক্ষমতাভোগীর কাছে যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। কিন্তু এখানেই বোধ হয় শেষ নয়। এমন একটা দিন বোধ হয় খুব দূরে নয়, যেদিন ৫২ শতাংশ চিহ্নিত অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর মানুষ সামান্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ভিক্ষার দান হিসাবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না; তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ৫২ শতাংশই তারা চাইবে—আর তখন তো আজকের ক্ষমতাশীল ১৫ শতাংশের অবস্থা আরো কাহিল হয়ে দাঁড়াবে!

পাদটীকা

1. B. R. Ambedkar, *Mr Gandhi and the Emancipation of the Untouchables*. Thacker & Co., Bombay, 1972, p 46.
2. For biography of Dr Ambedkar : W. N. Kuber, *B. R. Ambedkar*, N. Delhi & Dhananjay Keer, *Dr Ambedkar : Life and Mission*. Popular Prakashan, Bombay, 1971.
3. B. R. Ambedkar, *What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables*. Thacker & Co., Bombay.
4. Qouted from *Nehru on Gandhi*, p 72-3.
5. Same as fn 3. p 87.
6. Ibid, p 89.
7. Nicholas Mansergh (ed), *Constitutional Relations between Britain and India : The Transfer of Power*, vol 1, London, 1970, p 552.
8. *Constituent Assembly Debates*, Official Report, vol XI, no 11, 25 November, 1989, p 973.
9. Ibid, p 979.
10. Same as fn 3, p 15-6.
11. Constitution of India.
12. Ibid.
13. Ibid.
14. Report of the First OBC Commission.
15. Report of the Second OBC Commission.
16. Constitution of India.
17. Report of the Second OBC Commission, vol. 3, Part 1.

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা

অরুণা হালদার

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" রচনাটির অভীষ্ট ধর্মীয় ভাবনার উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিণতির পর্যালোচনা। রচনাটির ভূমিকা এবং আহরণপর্ব প্রকাশিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি (১৯৯১) সংখ্যায়। ওই পর্বের আলোচ্য বিষয় ছিল—কোন্ কোন্ উপাদান ধর্মীয় ভাবনার সূত্রে হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।—সম্পাদক

৩। সংগ্রহণ (ক)

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে এই "সংগ্রহণ" শব্দটির একটি বিশেষ অভিধা আছে। এটা হল—গ্রহণ করার আগে বা পরে কিছু পর্যালোচনা এবং সেইমতো গ্রহণ বর্জন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই প্রসঙ্গটির সংজ্ঞা অনেকাংশে যুক্তি দিয়ে গ্রাহ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষ যেমন-যেমন তার কৌশল দিয়ে, কুশলী কর্ম দিয়ে পার্থিব প্রকৃতির সহচারী হয়েছে, তখনই তার মনে হয়েছে ধর্ম সংরক্ষণ করা দরকার, এবং তা করতে গেলে যুক্তির সাহায্য নিতে হবে। অর্থাৎ, এখন থেকে সে বুঝতে শিখল বুদ্ধিগ্রাহ্য যা নয় তেমন কিছু কল্পনাশ্রিত ব্যাপারকেও যুক্তিনির্ভর করে তোলা যায়; আর আমাদের পক্ষেও বোঝা শক্ত নয় যে, আমরা প্রথম আর দ্বিতীয় যে চার্টের সাহায্যে মানবমনকে বিশ্লেষণ করেছি, তা চরিত্রগত-ভাবে স্ববিরোধী ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য এই যে সে দুটি থাকে একই সাথে; একই মানুষের মনে আর জীবনে দুটি প্রক্রিয়ার কিছু বেশি-কম অবশ্যই থাকে—এইমাত্রই প্রভেদ। কিছু মানুষ বেশিটা যুক্তিপ্রধান, কেউ-বা কল্পনাপ্রধান। কেউ বাইরে থেকে ভিতরে যান, কেউ ভিতর থেকে বাইরে আসার প্রয়াস করেন। এইজন্য কট্টর বৈজ্ঞানিককেও ভাবতে হয়—তিনি কোনো মহাশক্তিকে স্বীকার করেন কি করেন না। এই তত্ত্বটা আমাদের শতাব্দীতেই বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আর কবি রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতে বিধৃত হয়ে আছে। আইনস্টাইন বলেছিলেন: 'If there be any God He must be an intelligent being and an rapturous wonder.'

আমরা নিশ্চয়ই ভুল করব যদি ভাবি যে আদিম মানুষের পরে আসা অসভ্য যুগ আর বর্বর যুগের মানুষেরা এতখানি সূক্ষ্ম আর সুন্দর ভাবে ধর্ম আর ধর্মের অন্বিষ্টকে বুঝতে পেরেছিল। তাদের সম্বন্ধে

বলা যায়: এখন থেকে তাদের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ জীবন স্বচ্ছন্দতর হওয়াতে তারা যুক্তির শৃঙ্খলা দিয়ে কল্পনার উপাদানের মধ্যে একটা অর্থসঙ্গতি খুঁজে বার করল। আগের যুগের স্রোতঃপথে বয়ে-আসা ধর্মীয় উপাদান বেশির ভাগই রইল—কিছুটা বিস্মৃতিলীন হল ঠিকই। আবার একদিকে নূতন পরীক্ষানিরীক্ষার নিকষে যাচাই হয়ে পুরাতন তথ্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করল, অন্যদিকে নূতন তথ্যও গৃহীত হল। মানুষ মোটামুটি ঠিক করে নিল জীবনে ধর্ম আর ধর্মজিজ্ঞাসা দুই-ই আছে।

পূর্বোক্ত নূতন পথে দেখা গেল দেবতার আবির্ভাব হয়েছে নানা পথে নানা রূপে, এবং সেইসব নানা রকমের দেবতাকে অস্বীকারও করা যাচ্ছে না। এসব দেবতা এসেছেন ট্যাবু বা টোটেমের পথে (পূজা?) স্বীকৃতি নিয়ে; অনেকে এসেছেন সূক্ষ্ম শক্তির মাধ্যমে, অ্যানিমিজম, ফেটিশিজম আর স্পিরিটিজম প্রভৃতি নূতন সংজ্ঞাভিধেয় ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে। গঠিত হয়েছে দেবসমাজ বা প্যান্থিয়ন। দেবসমাজেও গৃহীত হয়েছে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ। মানুষের সমাজের উপজাত এই দেবসমাজে কিছু ঈথস বা মানবমঙ্গলনীতি অন্তত বহিরঙ্গ মরাল কনশাসনেসের রূপে দেখাও দিয়েছে। এই শেষোক্ত পদ্ধতির পরিণত রূপ হল কনশ্যানস বা বিবেক। অনেকে মনে করেন, বিবেকও বিকাশবাদের বিভিন্ন স্তরে অর্জিত একটা উত্তরণ। কথাটা বিবাদাস্পদ এবং বিচারাধীন। কারণ এখন দেখা যাচ্ছে, এরূপ একপ্রকার নিয়মশৃঙ্খলা মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে বেশ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। হতে পারে যে, এই নীতি আর নিয়মের পথেও কিছু দেবতার আবির্ভাব হল। তার সঙ্গে যুক্ত হল একটা ভীতিকর প্রস্তাব। অধর্মের বা কুকর্মের ফলে জীবনে বা জীবনে না হলেও জীবনের শেষে তার ভোগান্ত আছে। পাপপুণ্য কথার সংজ্ঞার সঙ্গে পাপপুণ্যের দেবতাও তৈয়ারি হল। ঈজিপটের আসুরিস আর ভারতীয় ধর্মরাজ বা যম ওই পারলৌকিক ফলদাতা বা বিচারকর্তা। আসুরিসের মুখ শিবাকৃতি বা কুক্কুরাকৃতি—তাঁর অনুচরেরা তৌলদণ্ড নিয়ে পাপপুণ্যের মাপ করছে, এমন চিত্র ঈজিপটীয় হায়রোগ্লিফিকে বিধৃত আছে। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম এবং নীতি ইত্যাদির ছত্রচ্ছায়ায় সব দেশের দেবদেবীকেই এসে পড়তে হল। টোটেমট্যাবুর পরিবার বাড়িয়ে তা পৌঁছল অনেক হিংসাত্মক শক্তির প্রতীকে। তাঁরাও পূজা পেলেন। মিশরীয় আসুরিস (প্রেতলোকের দেবতা বা কা-[মৃত্যু] দেবতা স্মরণীয়)। এই হিংসা-প্রতিহিংসার মধ্যে একটা স্থূল রূপের নীতিচেতনা জড়িয়ে গেল। ধর্ম-অধর্ম-পাপ-পুণ্য-সুনীতি-কুনীতি-স্বর্গ-নরকের কল্পনা-জল্পনা এসে গেল। "জন্মান্তর" কথাটা সম্ভবত গ্রহণ করা হয়েছে অস্ট্রালয়েড মানবগোষ্ঠীর থেকে, এবং তা থেকেই তা সঞ্চারিত হয়েছে আত্মা-পরমাত্মা, পরলোকে ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কল্পনার মধ্যে আর শেষ পর্যন্ত আবার ট্রান্সমাইগ্রেশন অভ সোল, এই কল্পনাটির মধ্যে। একদিন এই ধারণাগুলি স্থূলভাবাপন্ন ছিল। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে টুথ ফর টুথ আই ফর আই জাস্টিসনীতি পরিবর্তিত হল। মানবীয় ঈথস রূপ পেল। অধর্ম প্রবৃত্তির আর ধর্ম নিবৃত্তির পথ বলে বিশ্বাস করা হল। দেবতাদেরও রূপান্তর ঘটল—হিংসক দেবতার, প্রতিহিংসাপরায়ণ দেবতার ক্ষমাসুন্দর প্রেমের আর ক্ষমার দেবতায়। টোটেম আর ট্যাবুর মধ্য দিয়ে আরও কিছু দেবতার আবির্ভাব হল। এইভাবে গুচ্ছ-গুচ্ছ দেবতার দেবীর সৃষ্টি করল মানুষেরই মনোগত বিচিত্র কল্পনা। ঐতিহাসিক সনতারিখ না থাকলেও ব্যাপারটা প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে আজও পর্যন্ত অব্যাহত। যুগে-যুগে পদ্ধতিটি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। অন্যায় করলে তার ফল ভোগ করতে হবে, এবং অন্যায়কারীর সাজার বিধায়ক দৈবশক্তি বর্তমান। (১৯৩৪-৩৫ সালেও কলেজ স্ট্রীটে গোলদীঘির রেলিঙের গায়ে একদিকে সুন্দর স্যস

পেইনটিং দেখেছি, আবার তার পাশেই দেখেছি নরকদর্শন, অপরাধীদের যমদূতের সাজা দেবার চিত্র, মিথ্যাবাদীর জিহ্বা টেনে ধরা এবং অনুরূপ নানা চিত্র। এগুলি মনে হয় হিন্দু-মুসলমান মানসের একত্র গ্রহণে বাধা হত না।) ভারতের বাইরে মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন, বর্বর যুগের গ্রীস—সর্বত্রই এরূপ ভাবকল্পনা বিদ্যমান।

এই বিধিনিষেধের ব্যাপারটা থেকে বা ইউনিভার্সাল ঈথস থেকে একমাত্র এথিক্যাল রিলিজন যা জন্ম নিয়েছে তা হল বৌদ্ধধর্ম। এটা ভারতে জন্ম নিয়েও বিতাড়িত, এবং পুনর্বার এখন এই উপমহাদেশে পুনর্বাসিত। অপর দিকে আমরা দেখি অন্যান্য সকল ধর্মের সঙ্গেই জড়িত হয়ে গেছে খানিকটা নিয়মনীতি। আবশ্যিক আর অনিবার্য সে মিশ্রণ আমাদের জানায় যে ধর্মমতমাত্রেরই একটা নীতিসিদ্ধতা থাকবেই। উপরের এই স্রোতের নীচে কিন্তু পরিষ্কার টোটেম-ট্যাবুই দেখা যায়। টোটেম-ট্যাবু যেমন প্রয়োজনে তুলে দেওয়া যায়, প্রয়োজনে নিয়মনীতিও ভাঙা যায়। কচ্ছপ-টোটেমের লোক, হরিণ-টোটেমের লোক একদিন বিশেষ শুভদিনে তা শিকার করে মেরে খায়, পবিত্র বোধ করে। অপর দিকে কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম, ধর্মযুদ্ধ নামগুলি একই অর্থ বহন করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ধর্মবিচারের অনুষঙ্গ হিসাবে মানবসভ্যতা আদিকাল থেকে ধীরে-ধীরে প্রথমে ভীতিবিকার থেকে শুরু করে উত্তীর্ণ হয়েছে বিবেকখ্যাতিতে। প্রথমে যা ছিল ভয়, তা পরে রূপ নিয়েছে আত্মবলিদানের চেষ্টায়, আর এ দুটি পদ্ধতি প্রক্রিয়া যুক্ত হয়ে আছে ছায়াগোধূলিময় একপ্রকার ধর্মীয় চেতনার ছত্রচ্ছায়াতে। পালিত পোষিত হয়ে ক্রমে সামাজিক জীবনের মধ্যে ধর্ম একটি ইন্সটিটিউশন বলে স্বীকৃত হয়েছে। তার সঙ্গে অনেকগুলি সেনটিমেনট পূর্ণ পূর্ণতর রূপে অবস্থিত হয়েছে রিলিজিয়স সেনটিমেনটে। প্রায় সকল দেশেই ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে ন্যায়নীতির ধর্মাধর্মের যোগ আছে। বর্তমানে সেই ধর্ম-অধর্ম, ন্যায় আর নীতিকে মুচড়িয়ে টুইস্ট করে স্বার্থপ্রণোদিত করার প্রয়াসও হয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধ, "ইলিয়াড"-এ বর্ণিত যুদ্ধ, জার্মান লোকগাথা, খ্রীষ্টান-সারাসেনের যুদ্ধ থেকে শুরু করে অধুনাতন সমস্ত যুদ্ধেরই মুখের কথা হল ধর্মযুদ্ধ। এই বিচিত্র তথ্যটি অবলোকনযোগ্য।

আদিম মানুষের মধ্যেও বুদ্ধির তারতম্য লক্ষিত হত। সে বুদ্ধিও সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি হতে পারত। তদনুসারে বুদ্ধিমান সুবুদ্ধি লোক জেগে উঠে বেশ ভালোভাবে সুবিধাভোগী হতে পারল, বেশির-ভাগ লোকই তাদের কবলিত থাকল। সামাজিক স্তরভেদ এবং সেইমতো থাকা আর চলাফেরাও অভ্যস্ত হয়ে গেল। সবচেয়ে কম লোক হল সুবুদ্ধি, অথচ তেমন লোক যারা সুবিধাগ্রহণ করে নি। বস্তুত, তাদের থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট হিউম্যান ঈথস বা মানবমঙ্গলনীতির নির্দেশ পেয়েছি। নিষ্কাম কর্মমীমাংসার সন্ধানও তাঁরা দিয়েছেন। তাঁরা অন্য দুই দলের দ্বারাই নির্জিত হয়েছেন। মানবজীবনের বেসিক ফ্যাক্ট জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি, জীবন ও খাদ্য, প্রজনন-মৃত্যুক্রিয়া ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা কোনো সুখসুবিধা গ্রহণ করেন নি। যাঁরা করেছেন তাঁরা কেউ অজানা শক্তির দালাল পুরোহিত, কেউ রাজা বা ক্ষত্রপ, কেউ গ্রামবৈদ্য, কেউ-বা গ্রামবুড়ো হয়ে উঠেছেন। আসন সংরক্ষণ করেছেন।

ভয় থেকে ভক্তি

এক্ষেত্রে দুটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। এর একটি হল—মানবজীবনের আদি অধ্যায় থেকে (দ্বিতীয় চার্ট দ্রষ্টব্য) অনগ্রসর মানবমনে অজানার ভয়, তা থেকে বাঁচা আর বাঁচানোর কৌশলের একপ্রকার দুর্বল প্রয়াস, অনুকরণ, নতিস্বীকার আর অনুসরণ থেকে এসেছে। ন্যায়নীতির প্রাথমিক রূপ এসেছে ভয় থেকে—বিশেষ করে মৃত্যুভয় আর রক্তক্ষয় থেকে। এই মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি নেই। রক্তক্ষয় থেকেই জন্ম মৃত্যু দুইই। তদনুসারে মানবমন তার সমগ্র কার্যে ধর্মাধর্মের নির্দেশকে গ্রহণ করেছে মূলত এই দুটির নির্দেশনা থেকেই। কিছু আদিম মানুষের মধ্যে একটি প্রথা কিছুকাল আগেও ছিল। আদিম সমাজে নিয়ম ছিল—বৃদ্ধবৃদ্ধাদের একটি উৎসবান্তিক মৃত্যু। অক্ষম বৃদ্ধবৃদ্ধাকে খাইয়ে নাচিয়ে নেচে নেশা করে অবশেষে লগুড়াঘাতে বা পাথর দিয়ে মারা হত। মৃতের এতটুকু দেহাংশও বাকি সকলে শ্রদ্ধায় ধর্মভয়ে গ্রহণ করত। কারণ তারা বিশ্বাস করত যে এই জনকজননীরা তাদের উৎস, এবং তাদের দেহাংশ নিজেরা গ্রহণ করা একমাত্র পবিত্র কর্তব্য। পবিত্র কর্তব্য মনে করেই আফ্রিকার কিছু মানুষ আর তুন্দ্রা অঞ্চলের এস্কিমোরা বৃদ্ধাবস্থায় না মরলেও মরণকামী হয়ে সমাজ-পরিবার ছেড়ে চলে যেত পরবর্তী প্রজন্মের অন্নে ভাগ বসাবে না বলে। এরূপ মানসিকতা গড়ে উঠেছিল সামাজিক অবস্থানের প্রয়োজনে।

অপর দিকে, যেসব সমাজে মানুষ কিছু খাদ্যপ্রাচুর্য পেয়ে গিয়েছে, সেখানে এসেছে শ্রাদ্ধ, ভাণ্ডারা, চাল্লিশা, শোকচিহ্নধারণ প্রভৃতির মতো ক্রিয়া। কোথাও আছে মাজারে চিরাগ জ্বালানো, কোথাও কবরে মোমবাতি আর ফুল দেওয়া। স্মরণোৎসব শুধু ঘটা করে নয়, শ্রদ্ধায় পালিত হয়। একান্ত ধর্মবোধ তার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। আবার কোথাও-বা ব্যভিচারিণী নারীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলাও সমাজসম্মত। প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপের কোথাও-কোথাও প্রথা আছে যে, নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে স্ত্রী ধর্মবোধেই অন্য একজনের সাথে ইলোপ করবে (ড. মিসেস মীড)। পরে সে জননী হলে প্রথমজাত তিনটি সন্তানকে পরিত্যক্ত স্বামী সাদরে গ্রহণ করে থাকে। সেও ইত্যবসরে অন্য কারও স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এই সন্তানগুলি পিতৃমাতৃকল্পদের সংসারে পরিগৃহীত হয় সজ্ঞানে সস্নেহে। এই তাদের কর্তব্য। অপর দিকে, ক্ষত্রিয়ধর্মশাসনে প্রতিশোধ নিতে হয়। ভীমের গদা, দুঃশাসনের রক্তপান এজন্য প্রস্তুত উদাহরণ। আঞ্চলিক কিরাত আর নাগাদের মধ্যে শত্রুনিপাত শুধু নয়, নরমুণ্ডসংগ্রহও ধর্ম বলে ধরা হয়। বীরত্বসূচক হলেও শত্রুর প্রেতের ভীতি এদের মধ্যে কিছু পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা রেখেছে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন নৃকুলের মধ্যে নরবলি, দেবতার কাছে নরনারীনিধন, রাজা বা পুরোহিতের কবরে জীবন্ত দাসদাসী আর জীবন্ত পশুকেও কবর দেওয়া—এসব অনুষ্ঠানও আমাদের অজানা নয়। সর্পদেবতা বা অজানা দেবতার কাছে মানুষবলি দেওয়া (ক্রীট দ্বীপের অতীত ইতিহাস দ্রষ্টব্য) থেকে আজকের দিনে অনুষ্ঠিত পশুবলি আর কুরবানি পর্যন্ত আমরা একটা না একটা অনুষ্ঠানে প্রাচীন নিষ্ঠুরতার চরম ও মর্মান্তিক চিত্র এখনও দেখতে পাই। এখানে অচ্ছেদ্যভাবে ধর্মাধর্ম, ন্যায়নীতি, অজানার ভীতি, মৃত্যুর ভয় আর তাকে বিশ্বাস দিয়ে অতিক্রম করার মতো এতগুলি জটিল প্রক্রিয়া একত্র হয়ে রয়েছে আধুনিক সমাজেও। খ্রীষ্টীয় উপাসনায় যেমন স্যাক্রামেনট গ্রহণের প্রতীকী ব্যবস্থা আছে তেমনই আছে কপটিক চার্চের রহস্যময় অর্ধতান্ত্রিকতায় কুমারী গ্রহণ ও তজ্জাত শিশুর নিধন। সেই নিহত শিশুর শুষ্ক দেহাংশ মিশিয়ে রুটি প্রস্তুত হয়, প্রতীকী স্যাক্রামেনটে উক্ত সমাজে তা গ্রহীতব্য (দ্র. "গোল্ডেন বাউ", ফ্রেজার)। তন্ত্রোপাসনা এখনও প্রচলিত। কোনো-কোনো ধর্মে প্রতীকী ব্যবস্থায় এখনও কুমারীপূজা আছে। এগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। প্রচলিত ধর্মমতের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এগুলি চলে এসেছে। বিশ্লেষণ করে দেখলে একটা ভয়ের ভাব মিলবে—যেটা ভক্তির মূল বুনিয়াদ। ভগবানকে ভালোবাসা বিশ্বাস করা এসেছে অনেক পরে। কিন্তু মূলত অনুসন্ধান করলে জন্ম জন্মান্তর মৃত্যুভয় বলি পরিত্রাণ—এ কথাগুলি কোনো না কোনোভাবে ফেটিশিজমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেই। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আনন্দ উৎসব যাই থাকুক, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দিয়ে তার

শুরু এখনও হয়ে থাকে। পূজা অর্চনা লোক-খাওয়ানো—সবকিছুর মধ্যেই একটা পরিত্রাণের বা আত্মতৃপ্তির ভাবনা থাকে। দেবদেবীদের তোষণও ভীতি থেকে উৎপন্ন। ভিন্ন-ভিন্ন কল্পনায় শুধু আদিম দেবতার রূপ নয়, আধুনিক কালেও ভয়ঙ্কর প্রতিমারূপ চোখে পড়ে—দর্শনতত্ত্ব দিয়ে তা বিশ্বসনীয় করা হয়।

সংগ্রহণ ॥ থ

সংগ্রাহী কাজের আরও একটা বড়ো আধার হল প্রত্যেক বস্তুতে প্রাণত্ব বা প্রাণিক সত্তা আরোপ করে দেখা। আদিম মানুষ নিজের প্রাণিত্ব সম্পর্কে একটা বিবিক্ত চেতনা লাভ করেছিল। তা থেকে সে প্রতি বৃক্ষলতা পাথর থেকে প্রাণী-মাত্রতেই একটা শক্তিমত্তা অনুভব করত। তারা দেখত—বজ্রপাতে বন্যায় বৃষ্টিতে শীতে রৌদ্রে, বড়ো গাছের ডাল ভেঙে এবং বিষাক্ত লতা বা পাতার স্পর্শে প্রাণ যেতে পারে। অপর দিকে সূর্য আর আলো এবং কদাচিৎ দাবানল থেকে পাওয়া অগ্নিকে তারা সহায়ক শক্তি মনে করত। এমনই হঠাৎ-পাওয়া গাছপাতামূল থেকে তারা দৈহিক শক্তি পেতে পারত, খাদ্য আহরণ করত। তেমনই কিছু লোক অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ পরিবীক্ষণ বা অবজারভেশন করে কিছু গাছপাতাশিকড়ও আবিষ্কার করেছিল। এগুলি হয়ে উঠল ভেষজ। সেসব লোকও সাধারণের থেকে পৃথকীকৃত হয়ে উঠল ওই স্বলব্ধ ক্ষমতার জন্য। তারাও সুবিধাভোগী হল।

অগ্নির উপাসনা

আগুনে পোড়া খাদ্য, মাংস সুস্বাদুতর বোধ হল। শৈত্য নিবারিত হল অগ্নিতাপে। অথচ মানুষ তখনও আগুন জ্বালাতে শেখে নি। তারা আগুনটা ধরে রাখতে লাগল ইন্ধন দিয়ে জ্বালিয়ে রেখে। অন্ধকার ভয়াবহ, অগ্নি ভয়হারক। আবার অগ্নিজ্বালাও ভয়াবহ। বিদ্যুৎ-বজ্রপাতও তাই। অগ্নিকে গুহাতে রক্ষা করা হল। পরে কোনো সময় প্রাগৈতিহাসিক বিজ্ঞানী ফ্লিন্ট পাথর বা চকমকি ঠুকে অগ্নি প্রজ্বালন করতে পারল। সে হল দৈবী-শক্তিসম্পন্ন। বস্তুত, অগ্নিপ্রজ্বালনকারীর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ একভাবে হয়ে উঠল বিজ্ঞানমনস্ক। এর সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল ইট অথবা মাটির পাত্র পোড়ানো, আহার্যব্যবস্থাপনা, হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। এসব ছাড়াও, অগ্নি-আবিষ্কার মানবজীবনকে অন্য একটা স্তরে পৌঁছিয়ে দিল। এই কারণে আমরা বুঝতে পারি—মানবচেতনারও রূপান্তর হল। যা ছিল দুর্লভ, যা ছিল প্রয়োজনের, তা এল আয়ত্তে। মানুষ এটাকে বুঝতে পারল অতিরিক্ত প্রাপ্তি বা এক্‌সেস বলে। পরবর্তী ধর্মচেতনায় এই এক্‌সেস প্রিন্সিপল্‌ থেকে সক্রিয় হল কোনো না কোনোভাবে অগ্নির উপাসনা। এখনও প্রায় সকল প্রচলিত ধর্মে তা অব্যাহত আছে—হিন্দু ধর্মে তো বটেই। প্রাক্‌-হিন্দু পর্যায়ে বৈদিক উপাসনাপদ্ধতিতে অগ্নির বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত। অগ্নি যজ্ঞহবিকে বহন করে—অগ্নিই পরম শক্তি। নানা রকমের অগ্নি স্বীকৃত হল—আহিতাগ্নি, দক্ষিণাগ্নি, বড়বানল ইত্যাদি। মনে হয়, ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতি পূর্ব-দক্ষিণ ইয়োরোপে থাকার সময় প্রাকৃতিক গ্যাস আর অগ্নি (পেট্রলিয়ামজাত) দেখে অতি সুন্দর সূক্ত বা স্তোত্র রচনা করতে শিখেছিল। তেমনই তারা সোমরস (ক্যানাবিস ইনডিকা বা ভাঙ)-কে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সোমঘর্ষণ করার পাথরও তাদের কাছে পূজ্য ছিল। এইভাবে সর্বত্র শক্তির কল্পনা এক ধরনের পেগানিজমের রূপেই মানুষের কাছে উপস্থাপিত হয়। বৈদিক যুগের মানুষ স্ব-স্ব কল্পনায় তাকে সুন্দরতর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলেছিল। সেগুলি অনবদ্য কবিতা। অনেক সময় তাদের জোর করে ধর্মীয় মুখোশ পরানো হয়েছে। প্রাক্‌-বৈদিক

আর্যগণের রচনা পাওয়া যাবে স্লাভ ভাষার স্তুতিতে, নর্ডিক জাতির এড্ডাকাহিনীতে, হিট্টাইট নকুলের কিছু রচনায়, প্রাক্‌-ইসলাম ঈরানীয় জরাথুস্ট্রীয় মতবাদের সংহিতাগুলিতে। এদের মধ্যে স্বাজাত্য বর্তমান।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এসকল রচনাতেই প্রকৃতিদেববাদ বিদ্যমান। ঠিক পেগানিজম বলা যাবে না। বৈদিক সূক্তগুলিকে আনুমানিকভাবে চারটি বেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দিকে ক্রমশ এক ধরনের একদৈবতবাদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তারও পূর্বে দেখা যাবে "বিশ্বদেব" কথাটা। বিশ্বদেবকল্পনাও একপ্রকার একদেববাদের সমার্থক—একই শক্তিকে উদ্দেশ করে রচিত। কোনো একভাবে তবুও এ ব্যাপারকে একেশ্বরবাদ বলা চলে না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এর এক বিশিষ্ট নাম দিয়েছেন—এটি হল বৈদিক অ্যানিমিজম। অপরদিকে পেগানিজমের মধ্যে আছে বহুদেববাদ। তাকে বলা হয় পলিথীইজম।

এই বহুদেববাদের মধ্যে আহরণ করার উপায়-স্বরূপ অঙ্গীভূত আছে একটু নিম্ন পর্যায়ের পেগানিজম—প্রকৃতীশ্বরবাদ। ফেটিশিজম অথবা অ্যানিমিজম, স্পিরিটিজম এবং পরবর্তী কালের প্যানসাইকিজম সংযুক্ত হয়ে প্রস্তুত করেছে বিভিন্ন দেশের স্থূল সূক্ষ্ম পর্যায়ের পেগানিজম ও পলিথীইজম এবং ক্ষমতার স্বীকৃতিযুক্ত বহুদেববাদ (যেমনটি দেখা যায় গ্রীকো-রোমান প্যানথিয়নে)।

এইখানে বলা প্রয়োজন যে আমরা জানি না আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে। কিন্তু এটা সত্য যে মানুষই বিভিন্নতর চেতনার পর্যায়ে সৃষ্টি করেছে তত্তৎ দেবতাকে। তাদের রূপও সেজন্য বিভিন্ন প্রকারের। একথা বলাও ঠিক হবে না যে, প্রতি পর্যায়ে তথাকথিত ধর্ম বা রিলিজিয়নের সব স্তরগুলি বেশ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। এবং এই সীমারেখাও টানা যায় না যে কোন্‌ পর্যন্ত এল টোটেম ট্যাবু, বা অ্যানিমিজম বা ফেটিশিজম। সমস্ত প্রক্রিয়াটা একপ্রকার মানবজীবনের সাধনোপায়-সমন্বিত হলেও তা কিন্তু যুক্তিজনিত নয়। অযৌক্তিক বহু মালমসলা-উপাদান-সমন্বিত অবস্থায় প্রবাহিত স্রোতের মতো নুড়িপাথর পঙ্ক পল্বল শৈবাল সবকিছু নিয়ে সেই মননক্রিয়ার যাত্রায় কখন কোন্‌ আলোড়ন ওঠে, তার স্থিরতা নেই। তাকে বহুভাবে যুক্তিপ্রবণ করার চেষ্টা সার্থকতা লাভ করে নি। বরঞ্চ সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলে অন্তর্লীন একটা যুক্তির আবেগস্নাত রূপ আমরা দেখতে পাই—এই পর্যন্ত বলাই ঠিক। অতএব আমরা মনে করতে পারি যে, ধর্মের মালমসলা উপাদান ভয়ভীতি, জাদুক্রিয়া, অনুকৃতি, ভয়াতি, পলায়নীস্পৃহা; আবার ক্রোধের উন্মাদনা, শক্তির সঙ্গে ঐকাত্মিকতা এবং আরও নানা মিশ্র অনুভবকে একত্র করে দাঁড়াল ধর্মীয় চেতনা। সে চেতনার বাইরের আশ্রয় জোগাল টোটেম ট্যাবু, ফেটিশিজম, এবং আরও পরে জন্মান্তরকল্পনাসমন্বিত ট্রান্সমাইগ্রেশন অভ সোল এবং একপ্রকার সূক্ষ্ম স্তরের কল্পনা প্যানসাইকিজম। শেষের উক্তিটা দর্শনসমর্থিতও বটে।

পূর্বোক্ত উপাদানগুলিকে ঝাড়াই-বাছাই করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্থূল ধরনের বহুদেববাদ, প্রকৃতী-শ্বরবাদ, বা এক কথায় পলিথিজম। অনেক দেবতার কল্পনায় দেবসংখ্যা বেড়েই যায়। আর, এই দেব-কল্পনা যেহেতু মানবমননের তথা মানবজীবনের আর মানবসমাজের প্রতিফলনও বটে, সেই কারণে আধুনিক যুগের সোসিওলজি, অ্যান্থ্রপলজি, ভাষা-তত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানকল্পানুসারে ওই উপাদানগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাত্র করতে পারি। বুঝতে পারি: শুরু থেকে ধীরে-ধীরে প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় এই ধর্মসংস্থাপনা বা ধর্মবার্তা একটা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যেহেতু মানবসমাজ আর মানবজীবন ক্রিয়াশীল আর পরিবর্তমান, সেইহেতু উক্ত ধর্ম-ভাবনাও রূপান্তর গ্রহণ করে।

এই রূপান্তরণের মধ্যে নানা জটিলতাও যুক্ত হল। ধর্মভাবনা সম্বন্ধে চেতনা এল—সে চেতনায় সংস্কার গড়ে উঠল। বিধিনিষেধচেতনা রূপান্তরিত হল টোটেম, ট্যাবু আর ফেটিশিজমের উপাদান নিয়ে। এর থেকে ধীরে-ধীরে জাগ্রত হল সুনীতি-দুর্নীতি, সুমতি-কুমতি এবং ধর্মাধর্মের দ্বন্দ্ব-সমস্যা। এর সঙ্গে আরও যুক্ত হল ইহলোক-পরলোকের কার্যকলাপ। কর্মফল, পাপপুণ্য এবং স্বর্গনরকের কল্পনা মানুষের মাথায় স্থান পেল। মনে হয়, একটা সময় পর্যন্ত বিভিন্ন নৃকুলগোষ্ঠীর সীমিত চেতনায় এই ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলি উৎপন্ন হয়েছিল। এখনও হতে পারে তখনকার সমাজ-জীবনে অল্পস্বল্প যোগাযোগও ঘটত বিভিন্ন নৃকুলের মধ্যে। এই যোগাযোগের মূল প্রয়োজন ছিল জীবনের প্রসার এবং তদুপযোগী দ্রব্য আহরণের তাগিদ। সেটাও জীবনের ধর্ম।

যৌন জীবনে ধর্মের বিধিনিষেধ

একদল অন্যদলের সঙ্গে লড়াই করে শুধু দ্রব্যাদিই নিত না, লুট করত স্ত্রীলোক আর শিশুও। স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ছিল প্রজননকল্পে। (মনে রাখা দরকার, দলের বাইরেকার স্ত্রীলোককে দলে জোর করেই আনত—"বিবাহ" কথাটা তারই সমার্থক।) এ ছাড়া, দলের বাইরে স্ত্রীসংগ্রহ করাটা থেকেই এনডোগেমি আর একসোগেমির প্রচলন হল। যৌন জীবনের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে গিয়ে অত্যাচার অনাচার কম হয় নি। পরে তা বস্তুত শৃঙ্খলিত শৃঙ্খলায় রূপান্তরিত হতে লাগল। বোধ করি, ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধি-নিষেধ আরোপিত হল নরনারীর এই যৌন জীবন-যাপনের নানা দিক নিয়ে। পরিশেষে বিধিনিষেধ টোটেম-ট্যাবুর বেড়াজাল পার হয়ে একদিকে দেখা দিল ধর্মীয় জীবনে আরোপিত কঠিন বিধিনিষেধ বা সেলিবেসি, আর অপর দিকে দেখা দিল এক ধর্ম-পদ্ধতিভুক্ত যৌনাচার—যাকে পরে তন্ত্র নাম দেওয়া হল। আশ্চর্য কথা যে, অনেক নৃকুলের মধ্যে এজাতীয় অনুভব স্বীকৃত হল। চীন, তিব্বত, ভারতবর্ষের নানা স্থানে তা এখনও আছে। এসব কথায় পরে আমরা ফিরে আসব। প্রসঙ্গত, এখনও যৌনাচারের বিধি-নিয়মসহ একটা ভীতি বা অপরাধবোধ স্মারক হয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, আমাদের বর্তমান যুগেও কিছু কাল আগে কোনো-কোনো অস্ট্রালয়েড আর প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কিছু অধিবাসীদের সন্তান-প্রজননে যে স্ত্রীপুরুষসঙ্গমের প্রয়োজন, সেটা ধারণায় ছিল না। যৌনাচার তারা স্বাভাবিক আনন্দে নিষ্পন্ন করত। তাদের ধারণা ছিল—অশরীরী-অস্তিত্ববান স্পিরিটগুলি সমুদ্রবেলায় বাস করে, তাদের রাত্রিকালে ডাক দিলে পরে তারাই শিশু হিসাবে জন্মগ্রহণ করে (ম্যালিনভ্স্কি)। আর, অপর দিকে যেসব নৃকুলের মধ্যে প্রাগ্রসর ধারণায় যৌনাচার বিবেচিত হয়েছিল, তারা অনেকে মনে করত কোনো দেবতা থেকে তাদের প্রাথমিক উৎপত্তি হয়েছে। মিশরের ফারাওরা সূর্যপুত্র হিসাবে নিজেদের বিবেচনা করত, এবং সেই নীল রক্ত কেবলমাত্র এক ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধে প্রাপ্তব্য। এই কারণে, ভ্রাতা-ভগিনীই রাজারানী হিসাবে, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে অভিষিক্ত হত। ইনকা সভ্যতার মানুষদের মধ্যেও এই ব্যবস্থা লক্ষিত হত। অর্থাৎ ইনসেস্টবিধি এদের উপর প্রযোজ্য হয় নি। ভারতে কোচিন রাজবংশে একটি বিচিত্র প্রথা ছিল—রাজার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত অধিকারী ভাগিনেয়, পুত্র নয়। বিবাহিতা পত্নী কুইন কনসর্ট হলেও রাজ্ঞী নয়। যিনি ভগিনী তিনিই রাজ্ঞী। এটি বিবেচনা করার মতো ব্যাপার। দ্রবিড় সভ্যতায় মাতুলের সাথে বিবাহ এবং সম্পর্কিত ভ্রাতা-ভগিনীর (কাজিন্স্) বিবাহ প্রচলিত। একই প্রথা খ্রীষ্টান মুসলমান সমাজে বিদ্যমান। হিন্দু ধর্মের প্রাক্-ইতিহাসে এরকম কিছু থাকা সম্ভব মনে করি। জৈন রামায়ণে রামচন্দ্র আর সীতা ভ্রাতা-ভগিনী রূপে কল্পিত। অন্যত্র সীতা রাবণ-মন্দোদরীর কন্যা। এগুলি কিন্তু কিছু-কিছু ইনসেস্ট-এর সুপ্রাচীন ভগ্নাংশ, এবং ধর্মগ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত বলে দেখা যাচ্ছে। সূর্যবংশ চন্দ্রবংশ যথাক্রমে রামায়ণ-মহাভারতের নায়কদের বংশপরিচয়। এদের মধ্যে বহুবিধ নিয়োগপ্রথা ছিল; অশ্বমেধযজ্ঞ পুত্রেষ্টিযজ্ঞ—এগুলির শাস্ত্রীয় 'বিধান ছিল। অনুসন্ধানে দেখা যায়, অশ্বমেধের নির্দিষ্ট অশ্বটি-সহ রানীকে একরাত্রি এককক্ষে থাকতে হত। উদ্দেশ্য অশ্ববৎ বলিষ্ঠ সন্তান লাভ।

সমগ্র কুরুবংশের যুযুধান রাজারা শেষ দিকে ব্যাসদেবের সন্তান—বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। চন্দ্রবংশ নামটিও এইভাবে কল্পিত হয়। মনে হয়, ইলা-উপাখ্যানটি সম্বন্ধে পশ্চাদ্ভার বা জুফিলিয়ার ভাবনা কষ্টকল্পনা হবে না।

আমরা প্রাচীন যুগের আরও একটি বিশিষ্টতা লক্ষ করতে পারি। তথাকথিত আদিবাসীদের পদবী-গুলির মধ্যে সে পরিচয় বিধৃত আছে—ধান, পান, কচ্ছপ, একা প্রভৃতি শব্দ টোটেম-বাচক। কোনো-কোনো সম্প্রদায় বা জাতিরও এরূপ টোটেম-বাচক গোত্রনাম লক্ষিত হয়। বাঘ বা ভালুক গোত্রনাম আছে। কিন্তু এই যৌন সঙ্গমের সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ধর্মব্যাপারের অনুষঙ্গ বলেই ধরা হত। প্রাচীন বর্ণাশ্রমব্যবস্থায় প্রজনন-পরিকল্পনা ধর্মীয় চর্যা বলে গৃহীত। নিষিদ্ধ আর প্রতিষিদ্ধ সম্পর্কও শাস্ত্রানুমোদিত বৈবাহিক ব্যবস্থা সামাজিক তথা বৈধ করে নেওয়া হত। যেমন, গান্ধর্ব বিবাহ বা রাক্ষস বিবাহ, পৈশাচ বিবাহ। এসব নাম পরে দেওয়া হয়ে থাকবে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাক্-বিবাহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ-তরুণীর যৌনাচার একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থা। কিন্তু পূর্বোক্ত যে তন্ত্রাচারের কথা আমরা বলে এসেছি, তার ব্যাখ্যা একমাত্র করা যায় একপ্রকার যৌন ট্যাবুর নিয়মভঙ্গ হিসাবে। বলা বাহুল্য, এই নিয়মভঙ্গের পিছনে ধর্মীয় অনুমোদন আছে। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নরনারীর এ ধরনের একত্র সহবাস, এবং সেই সহবাসের নানা সমর্থক যুক্তি অদ্যাপি বর্তমান। যে কারণেই হোক, টোটেম ট্যাবু ধর্মব্যাপারের সঙ্গে বিশেষভাবে একত্র জড়িয়ে গেছে। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্' কথাটা সত্য ঠিকই, তবে সেই গুহা থেকে নানারকম বিচিত্র ব্যবস্থা আর তথ্য আমরা আজকের দিনেও পেয়ে যাই। যুক্তির তীক্ষ্ণতা দিয়ে পথ করে যাওয়া গেলেও, অনেক ক্ষেত্রেই এই তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারটাকে গোপনীয়তা আর রহস্যময়তা দিয়ে দলগত ভাবে সাম্প্রদায়িক করে রাখা হয়, অতীন্দ্রিয় ভাবনাও আরোপিত হয়।

যে-কোন ব্যাপারে পূজা বা ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে অবশ্যই দেবদেবীরা যুক্ত। মানবমন এদের বিচিত্রভাবে গ্রহণ করেছে, এবং বিচিত্রতর চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছে। প্রিমিটিভ কমিউনিজমের অবস্থায় কোনো ধর্ম- বোধ বা -চেতনা থাকা সম্ভব ছিল না—ভয়-ভীতি অসহায়তা নিয়েই মানুষ চলাফেরা করেছে। অগ্নির পরে অস্তিত্বের সঙ্গে-সঙ্গেই চেতনা বেগবান হয়ে অনেকখানি গুরুত্ব আবিষ্কার করে ফেলতে পারল। তখন থেকে সে তার মনোমত স্বস্তিদায়ক শক্তির কল্পনাও করল, এবং সাথে-সাথে ভয়াবহ শক্তিগুলিকে মান্য-করতে লাগল। দুইয়ে মিলিয়ে শুভাশুভজাতীয় বহু বিচিত্র শক্তির মূর্তি আর পূজার কল্পনা হতে লাগল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে হিংস্র পশু আর সহায়ক পশুর পার্থক্য করতে পারল মানুষ। প্রথমের দিকে প্রাণীর সঙ্গে তার খাদ্যখাদকসম্পর্ক—সে হিসাবেই সে চাইত পশুরা সহজলভ্য হোক। পশুদের ছবি আঁকা সম্ভব হল। নিহত পশুর হাড় চামড়া কাজে লাগল (ফেটিশ হিসাবে রাখাও হত)। পশু পোষা হতে লাগল খাদ্য হিসাবে। তা সত্ত্বেও প্রথমে কুকুর আর পরে ঘোড়া-গোরুও তারা পুষল। কুকুর বোধকরি সহায়ক হিসাবেই মানুষের কাছে থাকাটা পছন্দ করে নিয়েছিল। খাদ্যের পরিত্যক্ত টুকরোগুলি তারা খেত—দেখা গেল তারা পশুদের রক্ষাও করে।

গো-দেবতা, অশ্বদেবের মতো সাথে-সাথে ভীতিপ্রদ সর্পদেব, কুম্ভীর, ব্যাঘ্র প্রভৃতিও দেবকল্প হল। আফ্রিকার নানা অঞ্চলে এসব জীবন্ত দেবতাদের খাদ্য হিসাবে মানুষও পাঠানো হত। পরোক্ষ পূজার ভাবটা এসেছে এই তোষণনীতির মাধ্যমে। পরের দিকে অবশ্য এই তোষণনীতির ভয়ানকত্ব কমে সেটা একটা প্রতীকী ব্যবস্থায় পরিণত হতে দেখা যায়। সংস্কৃতির উত্তরণের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে বলি আর পশুমেধের ক্ষেত্রে দেখা দিল পুষ্পপল্লব বা অনুরূপ কোনো প্রতীকী ব্যবস্থা। মাথা দেওয়ার বদলে কেশদান। মুণ্ডনব্যবস্থা, ত্বকচ্ছেদ (সেমেটিক-হেমেটিক নুকুলের মধ্যে), দেবমন্দিরে নারীর দেহ-দান, ক্রীতদাসদের মনিবের সাথে-সাথে জন্ত ইত্যাদি সহ জীবন্ত কবর, দেবতাদের উদ্দেশে নরবলি ঠিক না দিলেও, এসব প্রথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়ে দীর্ঘ কাল স্থায়ী ছিল—সমগ্র অসভ্য যুগ থেকে বর্বর যুগ পর্যন্ত।

এই সময় আর-একটা বিষয় লক্ষণীয়। লোভ বাড়ছিল, কর্মশক্তি বাড়ছিল, কৃৎকৌশলের মাধ্যমে হাতিয়ার তৈরি হচ্ছিল (ব্যাটারিং র‍্যাম-এর মতো অস্ত্রের ব্যবহার অজানা ছিল না আর; অজস্র অস্ত্রশস্ত্রসম্ভার ধাতু গলানোর পর থেকে তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন নুকুলের মধ্যে)। এদের মধ্যে হিট্টাইটরা সুপ্রাচীন কাল থেকে লৌহশাস্ত্র আর অশ্বশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিল। আদিকালে তারা ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত নুকুল ছিল—বাস ছিল মূলত আনাতোলিয়া প্ল্যাটা অঞ্চলে। এদের মধ্যে যার যেমন প্রয়োজন তেমন-তেমন দেবদেবীও তৈরি হয়েছিল। মানবসমাজের রিফ্লেকশন হিসাবে যা তৈরি হল তার নাম দেবসমাজ (প্যানথিয়ন)। দেবসমাজের দেবগণ আর মানুষদের কাজকর্মের খুব একটা ভেদ লক্ষিত হত না। কারণ, ক্রোধ হিংসা রেশারেশি, আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতদের পক্ষগ্রহণ এবং যুদ্ধকালীন প্রতিহিংসা তথা প্রতিশোধপরায়ণতা তৎকালীন মানুষের মতো দেবতাদেরও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সুমেরীয় দেব-দেবীগণ, ব্যাবিলনীয় দেব-দেবীগণ, মিশরীয় দেব-দেবীগণ, পরিশেষে গ্রীকো-রোমীয় দেব-দেবীগণের পরিকল্পিত রূপ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। প্রাচীন বীরগাথাগুলি দেবগাথাও।

প্রাকৃতিক শক্তির আধারে দেবযান

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এইসকল দেবসমাজ / দেবযানের দেবতাগণ কিন্তু সংগৃহীত হয়েছেন মূলত প্রাকৃতিক শক্তির আধারে। আকাশ-দেবতা জুপিটর, জিউস বা দ্যুস্পতি; দ্যমিতর বা ধরিত্রী পৃথিবী; আমন বা অ্যাপলো সূর্যদেবতা (পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধব্যাপী); অগ্নিদেবতা; ইন্দ্র-কল্প মেঘ আর বজ্রের দেবতা; বরুণ শ্লাভ ভাষায় পেরুন পের্কুনাস); প্রজননশক্তির দেবতা বৃষ ও বৃষকল্প কেউ; উর্বরাশক্তির প্রতীক ক্যুবিলিস; মাতৃশক্তি তথা ধাত্রীশক্তি হিসাবে স্বীকৃত আইসিস আর সিরিস, গৌরী-গণপতি; শক্তির প্রতীক মার্স; স্ত্রীশক্তির প্রতিভূ ডায়ানা-আর্টেমিস; বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী মিনার্ভা (সরস্বতী)। দেবতাদের সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাহন বা প্রিয় জন্তুও পূজিত হত। জ্ঞানদেবতার প্রিয় পেচক, অথবা এদেশীয় লক্ষ্মীর প্রিয় পেচকের নাম আমাদের অজ্ঞাত নয়। লক্ষ্মী আর লাকাম কথা দুটি সমশাব্দিক শুধু নয়, প্রায় সমার্থবাচক। অগ্নির বাহন ছাগ, সূর্যের বাহন অশ্ব—এসব সুপ্রাচীন কল্পনা। দেবতারা মানুষেরই মতো, তবে বেশি শক্তিধর। বীর হারকিউলিস যে প্রমেথিয়ুসকে মুক্ত করেন তিনি বিরাট শক্তিতে চ্যালেঞ্জ করেন জিয়ুসকে। প্রমেথিয়ুস অগ্নিকে মানবহিতার্থে নিয়ে আসেন পৃথিবীতে। এজন্য তিনি জিয়ুসের বিরাগভাজন হন। দেবরানী জুনো অতীব হিংসাপরায়ণা। একদিকে দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে; অপর দিকে

দেখা যাচ্ছে এই দেবতারা তাদের গৃহসংসার-আত্ম-পরিজনসহ মানবমণ্ডলীরই একটি কল্পিত বা ঈপ্সিত প্রতিষ্ঠান। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে এই দেবতারাই আদিতে প্রাকৃতিক শক্তিরই স্বীকৃতি-প্রাপ্ত। এদের গঠনে মিশে আছে অ্যানিমিজম স্পিরিটিজম ইত্যাদির মতো ব্যবস্থা। সেই নিউ-ক্লিয়সের উপর বিস্তর পলস্তারা করার পর এক-একটি দেব-দেবী রূপগ্রহণ করেছে। কোনো নুকুল—বিজয়ী বা বিজিত যাই হোক—অন্যের দেবতাদের বর্জন করার মতো দুঃসাহস তাদের ছিল না। অতএব মিশ্রণের ফলে, দেবদেবীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকল স্বাভাবিকভাবে।

এক স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার সময় মানুষ পাথরের টুকরো, মাটির ঢেলা বা দু-একটা গাছগাছড়াও নিয়ে যেত। অন্য জায়গায় উপনিবিষ্ট হবার সময় এসব গাছ-পাথরের মধ্যে আবির্ভাব হত দেবতার। ভেষজ গাছপাতা, মৃত মানুষ বা জন্তুর হাড়ও এভাবে যেতে পারত, এবং অবশেষে তা পরিণত হত দেব-মাহাত্ম্যে। এভাবে দেবতার জন্ম আদিম যুগ থেকে হয়ে আসছে, এবং এবং এখনও আগমন আবির্ভাব বন্ধ হয় নি। পীরের মাজার, পবিত্র কবর, সেনট জেভিয়ার্সের মৃতদেহের রক্তক্ষরণ হয়—এরকম বিশ্বাস এখনও আছে। জলপড়া, তেলপড়া, ইটবাঁধা, মানত-পূজা এখনও ধর্মীয় ভাবনা থেকে তার শক্তি সঞ্চারিত করে। এই সেলফ-সাজেসশন, সেলফ-হিপনটিজম, অনুকরণ, বহুজনার সঙ্গে নিজেকেও মিলিয়ে দেখার প্রবৃত্তি সব দেশের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে বর্তমান। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, নর আর নারী—কেউ তার ব্যতিক্রমের পাত্র নয়। এসব ক্ষেত্রে একটা তাত্ত্বিক সৌষম্যও পাওয়া যায়। ধর্ম পৃথক হলেও এরূপ সংস্কারকে মেনে নেওয়ার মধ্যে মানুষ একটা কোনো আশ্বাস খুঁজে পায়। এরই একটা পরিমার্জিত রূপ মেসমার-প্রবর্তিত মেসমেরিজম। রীতিমতো ঘটা করে জমকালো পোশাক পরে তিনি রোগীর চিকিৎসা করতেন। কোনো-কোনো রাজার (ব্রিটেনের) স্পর্শে গণ্ডমালারোগ থেকে মুক্তি ঘটত। মৃদু হিপনটিজমের প্রভাব লক্ষ করা যায় বড়ো-বড়ো নেতাদের, ধর্মীয় পুরোহিতদের এবং যুদ্ধবাজদের অপভাষণের মধ্যেও। যে যত বড়ো বক্তা, তার হিপনটিক প্রভাব তত বেশি লোকের উপর পড়ে। ভালো-ভালো শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে। আবার বড়ো-বড়ো কথকদের বাক্যাবলীর মধ্যেও সেই একই স্পর্শ পাওয়া যায়। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে—সুন্দরবন অঞ্চলে যে বাওয়ালি মানুষদের কথা আছে, তাদের কাজই দুঃসাহস আর বাগবিস্তার করে আশ্রিত মানুষকে আশ্বস্ত করা, এবং তারই সঙ্গে মনে হয় এদের দুঃসাহসী স্পর্ধায় ব্যাঘ্রদেবতাও কিছুটা সরে যায়। হয়তো সে ক্ষুধিত থাকে না, অন্তত সে সময়।

অনুরূপভাবে আবির্ভূত হয়েছে বলে মনে হয় প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কনটিকি, এদেশী ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়, কুম্ভীরদেবতা কালুরায়, আফ্রিকা মাদাগাসকারের বিচিত্রমুখ ভয়ালদর্শন দেবকুল, আমেরিনডিয়ান দেবতাসমূহ। কোথাও-কোথাও কয়েকটি সংস্কৃতির মিশ্রিত ভাবনা জন্ম দিয়েছে মিশ্র-রূপের দেবতার—যেমন দক্ষ প্রজাপতি (অবশ্য দেবতা নয়), স্বয়ং শিব এবং ভীষণা মহাকালীও ("মানবমন"-এ প্রকাশিত লেখিকার "শিবকথা" দ্রষ্টব্য)।

শেষোক্ত দেবদেবীদের সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বও গড়ে উঠেছে। সেটার র‍্যাশনেল বুদ্ধিমান মানুষকেও আকৃষ্ট করে। কিন্তু প্রায় প্রতি পূজা-উপাসনার পিছনে একটা অকথিত ভয় এবং লোভের পূর্তির জন্য আপস-রফার একটি ব্যাপার লুকানো থাকে না। অপরাধ-বোধও অনিবার্যভাবে মিশে থাকে। তবে, মানবসংস্কৃতির উত্তরণের সঙ্গে-সঙ্গে এসব দেবতার অনেকটা মনুষ্যোচিত গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপনও করা হয়েছে। যেমন, বেশি দিনের কথা তো নয়—দুই দশক পূর্বে স্পেনের ফতিমা গ্রামে লেডি অভ ফতিমার আবির্ভাব সমস্ত বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। তিন দশক পূর্বে বুদ্ধের মুখ্য শিষ্য মহামৌদ্গল্যায়ন এবং

শারদ্বতীপুত্রের দেহাবশেষ নিয়ে বৌদ্ধ দেশগুলির থেকে সংগৃহীত একটি চলমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, বৌদ্ধ স্তূপগুলির অন্তরে কোনো কিছু দেহাবশেষ থাকেই। অপর পক্ষে, বৌদ্ধ চৈত্যগুলি শুধুমাত্র উপাসনার জন্য বিধৃত। এই উদাহরণগুলি বিশেষভাবে দেবার কারণ একটাই। মানবজীবনস্রোত এ পর্যন্ত উপলব্যথিত গতি নিয়ে বয়ে চলেছে। চলার পথে আদি থেকে অদ্যাবধি সংগৃহীত ও পরিবাহিত অজস্র ধর্মীয় উপাদানও বয়ে চলেছে এবং রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু এগুলি থেকেই যাচ্ছে। মরুভূমির দেশগুলিতেও দেবপূজা ছিল। জুইশ মাকাবিরা তাদের মূল মন্দিরে শূকরবলির বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সেমেটিক হেমেটিক নৃকুলের মধ্যে শূকর অপবিত্র পশু। হিন্দুদের মধ্যে গোরু পবিত্র বলেই খাদ্য নয়। (কোনো ইয়োরোপীয় হোটেলে ভারতবাসীকে খানা পরিবেশন করা বড়ো শক্ত···এটা আমার স্বচক্ষুতে দেখা। খাদ্যাখাদ্যনিশ্চয়ের তালিকায় বিভিন্ন মতে গোরু শূকর মুরগি ডিম নিরামিষ স্বীকৃতি পায়।)

হিন্দু ব্যতিরেকে গোপূজা অন্যত্র সম্ভবত হয় না। কিন্তু গোপূজক হিন্দু যাদবের হাতে কিংবা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যেভাবে গোবধ নিষ্পন্ন হয় (গাভী বলদ ষাঁড় সবই) তার কষ্ট বর্ণনাতীত। বরঞ্চ গোপূজক নয় অথচ গো-খাদক নৃকুলের লোক গোপালন সম্বন্ধে অবহিত। আমার এই দৃষ্টান্তটি ধর্মসংক্রান্ত একটি আত্মছলনার উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করলাম।

এদেশেও অন্যান্য দেশের মতো গাছ- পাথর জন্তু -পূজা ছাড়াও আরও কিছু দেবতার মনোনয়নও ঘটে থাকে। এসব দেবতাকে কাঁচাখেকো দেবতার নাম কেন দেওয়া হয় তা ঠিক বুঝতে পারি না। কলেরা (ওলাবিবি), বসন্ত (শীতলা), জ্বর (জ্বরাসুর), খোসপাঁচড়া-চর্মরোগের দেবতা (ঘেঁটু বা ঘণ্টাকর্ণ)—এগুলিকেও তো বাদ দেওয়া যায় না। এদের আবির্ভাব চিরায়ত। মানুষ তখন রোগব্যাধি বুঝত না। অথচ রোগব্যাধির ভয় তাদের বাধ্য করত রোগটাকে অপদেবতার শক্তি বলে গ্রহণ করতে। বস্তুত, এই কঠিন রোগগুলিকে পুঁজি করে অন্তত এদেশে "রোগের বামুন" বলে একজাতীয় মানুষের জীবিকা-নির্বাহ হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবনে দুর্ভিক্ষ বা আকালের সময় পুষ্করা-নামক অপদেবতা আর তার রক্ষয়িত্রী হিসাবে রক্ষাকালীর কল্পনা আছে। কালী-ঠাকুর, যতটা মনে হয়, চীন থেকে আগত কয়েকটি তান্ত্রিক স্ত্রীদেবতার অন্যতম। শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার এবং লিভারের অসুখকে পেঁচোয় পাওয়া বলে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা গ্রামে আছে। দেবতার ভর হওয়া, হিস্টিরিয়া রোগে ওঝা দিয়ে ভূতপেতনি তাড়ানোর আসুরিক চিকিৎসা—এগুলি বর্তমান অবস্থাতেও আছে।

মিশরের ফারাওরা নিজেদের সূর্যপুত্র বলে জানত। আমাদের দেশে নিঃসন্তান নারীর "হত্যা" দেওয়ার ব্যবস্থা আছে নানা দেবস্থানে। রোগমুক্তির জন্যও হত্যা দেওয়া হয়। (সিংহবাহিনীমন্দিরে শ্রীশ্রীমা সারদামণি হত্যা দিয়ে ভালো হন।) এই অর্ধসত্য পরিকল্পনার মধ্যে কতটা মানবহিতৈষণা আছে আর কতটা আছে মানবীয় অপচিকীর্ষা, তা আজও রহস্যাবৃত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানবসমাজের আদিকাল থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দেশকালপাত্রে ব্যবস্থিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সেসব সমাজে স্থানীয় বিভেদ সত্ত্বেও স্থায়ী কতকগুলি ধর্মীয় অনুষঙ্গ গড়ে উঠেছে। তাদের আধার সন্ধান করলে পূর্ববর্ণিত চার্ট-সহযোগে এখানেও বুঝতে হবে (চার্ট ১, ২, ৩)। ধর্ম, ধর্মদেশনা এখন সামাজিক জীবনে একটা স্থায়ী স্থানই করে নিয়েছে ইনসটিটিউশনরূপে। কিন্তু, তার আজকের পরিশীলিত রূপের মধ্যেও সেই আদিকালের মালমসলাগুলি রয়ে গেছে। বিশেষ করে ভয় আর ক্রোধ—এ দুটি ধর্মীয় জীবনে ওতপ্রোতভাবে সংলগ্ন। এতটুকু ভারসাম্য হারালেই জনজীবনে একটা আলোড়ন আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ভয় আর ক্রোধ, হিংসা প্রত্যাঘাত সহসা হাতের বাইরে চলে যায়। এর একটা প্রধান কারণ হল ধর্মের মূলনীতি সত্যই প্রক্ষোভ বা ইমোশনের কবলিত। অপর দিকে, যুক্তি আর রীজন-এর জোড়াতালি দিয়ে ধর্মকে আমাদের জীবনে অনুশীলন-পরিশীলনের মাধ্যমে একটা শুচিশুভ্র জ্যোতির্ময় আবরণে মুড়ে দেখার এবং দেখাবার প্রয়াসও করে চলেছি। ইভলিউশনের পথে সমাজ-সংসারের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব হয়েছে খানিকটা—শুধুই খানিকটা মাত্র। অবশ্য সেই খানিকটা অনুভূতি থেকে জন্মলাভ করেছে সুন্দর সাহিত্য (সব সাহিত্যই আদিতে ধর্মমূলক), অপূর্ব মূর্তিকলা (তাতে সৌন্দর্য আর বিশালতা দীপ্যমান), আশ্চর্য সুন্দর সব দেবায়তন (মন্দিরশিল্প) এবং অবশ্যই মানবীয় মূর্তিগুলিও। তুর্ক-বাইজানটাইন রীতির স্থাপত্যে গড়া মসজিদ আর চার্চ, গথিক রীতিতে রচিত চার্চ, মিশ্র রীতিতে গড়া সমাধিমন্দির (তাজমহল), সর্বোপরি বিশাল পিরামিড (সমাধি-মন্দির) এবং বৌদ্ধ স্তূপ, জৈন মন্দির এবং হিন্দু দেবায়তনগুলির অনবদ্য শিল্পরূপ নিশ্চয়ই ধর্মবোধের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে উঠেছে। তারই পাশাপাশি স্মরণ করতে হয় জুইশ মন্দিরে মুসলমানের হস্তক্ষেপ, মুসলমানের মসজিদ ভাঙার তৎপরতায় অগ্রসর খ্রীষ্টান, হিন্দু আর বৌদ্ধের পারস্পরিক হিংসা এবং হিন্দু-কর্তৃক বৌদ্ধমন্দিরকে হিন্দুমন্দিরে পরিণতকরণ; আবার মুসলমান-কর্তৃক মন্দির ও মূর্তির উচ্ছেদসাধন—কোনোটিই হিংসার তীব্রতায় কম যায় না। (আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে রামমন্দির ও বাবরি মসজিদ ব্যাপারটি এইপ্রকার উদাহরণ।)

ধর্মাচরণ—সেফটি ভালভ

ধর্মকে আফিম বলেও লাভ নেই, আবার ধর্মকে দূরীভূত করার পরিকল্পনা আজ বৃথা। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর বসু বলতেন—মানব-প্রকৃতির কিছু সেফটি ভালভ আছে, ধর্মাচরণ সেই কাজটা করে। শুচিবায়ুগ্রস্তকে যুক্তিশীল করতে গেলে মনোরোগ দেখা দিতে পারে। শোকের তীব্রতার ক্ষেত্রে মূর্তিপূজা বা উপাসনায় সাময়িক কাজ হতে পারে, সান্ত্বনা মিলতে পারে। গঙ্গাস্নান করা বন্ধ করিয়ে মানসিক অশান্তি বাড়িয়ে তোলার চেয়ে গঙ্গাস্নান বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ধর্ম কথাটাকে, এথিকস্ কথাটাকে তার দৃঢ়প্রোথিত রূপ থেকে আজই কিছু সরিয়ে দেখা যাবে না।

শুধু একটা কথা মনে রাখা দরকার। পুনরুক্তি করেই বলছি—ধর্মের ভিত্তিটা যুক্তিহীনতায় দুর্বল আর কাঁচা। পৃথিবীর গর্ভে যেমন সব সময় অসহ্য উত্তাপে গলিত ধাতু-স্রোত বার হবার পথ খুঁজছে, ধর্মনিষ্ঠতারও একটা সেইরূপ উপপ্লবকারী শক্তি আছে। সেটা কখন কোন্ পথে লাভাস্রোতের মতো ফেটেফুটে বার হয়ে আসবে তা আমরা জানি না। সেটা জানি না বলেই সে স্রোতকে আটকানোর পথও আমাদের হাতে নয়—এক ধরনের উপপ্লব এবং ডিভাস্টেশন সেই স্রোতের পথে বার হয়ে আসতে পারে। আবার, সেই পথের যুগপ্রবর্তক পথিক-দেরও আমরা অভিনন্দিত করি। যেমন, বুদ্ধ খ্রীষ্ট সোক্রেটিস লাওৎসে কনফুসিয়াস সুফী-সম্প্রদায় ভারতীয় সন্ত কবিসাধকগণ শ্রীচৈতন্যদেব, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, গান্ধী প্রমুখ নরদেবতাগণের আবির্ভাবও সেই পথেই হয়ে থাকবে। এঁরা নিজেরা কেউ একটা মতবাদস্থাপনে উদ্যোগী হন নি। মানুষকে তাঁরা আত্মানুসন্ধানের পথ দেখিয়েছিলেন, অন্তর-বাহিরের সমন্বয়-সাধনা করতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের নিউক্লীয়স করে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরমত-অসহিষ্ণু আচরণ গড়ে উঠতে থাকে। সৃষ্টি হয় সম্প্রদায়গুলির। যাদের মধ্যে প্রায় মুখ-দেখাদেখিও নেই। আরও আশ্চর্যের কথা, প্রতি ক্ষেত্রেই প্রায় এসব যুগপথিককে নিয়ে প্রতিপক্ষশালী জনমত রাজরোষ এবং আন্দোলন গড়ে উঠেছে যেজন্য

তাঁরা নিজেরা দায়ী নন। এসব ধর্মীয় আন্দোলন সহকারী রাজনীতিক আন্দোলন প্রাচীন মানুষের সমাজ-জীবনে সুবিধাভোগকারী চিকিৎসক-ওঝা-পুরোহিত ও শক্তিশালী দলপতির একত্র হওয়ার নীতি মনে পড়িয়ে দেয়।

সংগ্রহণ ॥ গ

পূর্বোক্ত প্রকারে দেবকুল অথবা দেবসমাজ আহরিত হওয়া ছাড়াও আরও একটি প্রক্রিয়া এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। মানবজীবনের উপাদান গ্রহণ যেমন-যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, ঠিক তেমনই ভাবে মানবীয় বুদ্ধিরও বিকাশ হল। এই বিকাশের পথ ঠিক সতত সমভাবাপন্ন ছিল না, তাতে ক্রমশ বিচারবোধসহ সুনীতি-কুনীতির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও প্রকট হয়েছিল, এমন অনুমান করা যায়। পূর্বে একবার উল্লেখ করে এসেছি যে তথাকথিত ধর্মভাবাপন্নতার সঙ্গে কখনও-কখনও সামাজিক-নৈতিক (পরবর্তী কালে রাজনৈতিক) কিছু আলোড়ন আন্দোলন ঘটতে থাকে। নেতারা কেউ-বা শাসক-রাজা, কেউ-বা পুরোহিত, কেউ-বা রাজা-পুরোহিত একত্রেই। ক্ষমতার লোভ তাদের শীর্ষে তুলতে পারে। সেজন্য কিছু পরিচালিত মানুষকে পরিচালক হিসাবে তাদের সঙ্গে রাখতে হয়। এই পরিচালিত মানুষেরা সবাই যে বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরিশীলিত—তাও নয়। তবে মানুষে-মানুষে তারতম্য বা অধিকারভেদ তখনও ছিল, এখনও আছে। লোকসংখ্যা, অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা এইগুলি বেড়েছে। এখনকার আমজনতা আর সেদিনের পরিচালিত জন খুব পৃথক নয়। যাই হোক, পরিচালন-ব্যবস্থায় বিষম অসমতা দেখা দিলে দলবদ্ধ মানুষও ধৈর্যচ্যুতির ফলে মাঝে-মাঝে বিদ্রোহ করত। এখন যেমন শহীদ হয়, তখনও সেরকম হত। একদল হেরে যেত, প্রতিপক্ষ দল তখন বিজেতা নেতা-সহ আবার সঙ্ঘবদ্ধ হত। এই নেতৃত্বদানকারী মানুষকে বীর বলে স্বীকার করা হত। প্রাচীন সাহিত্যগুলির কিংবা মহাকাব্যগুলির বেশির ভাগকেই বীরগাথা বলা যায়। এই পরাক্রমশালী বীরেরা পরের দিকে দেবত্বপ্রাপ্ত। যেমন, বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, উপেন্দ্র বা মহেন্দ্র। "ইন্দ্র" শব্দের অর্থ হল শক্তি। শ্লাঘ বীর ইগরকেও এরূপ পরিত্রাতার আসন দেওয়া হয়। এসকল লেজেনডারি হীরো বা বীরপুরুষকে পরের যুগে শুধু দেবমানব নয়—দেবতা বলেই ধরা হত। এইভাবে দেবতাসৃষ্টি এখনও যে বন্ধ হয় নি, তার প্রমাণ গান্ধীজীর স্বয়ং আরাধিত হওয়া। "শহীদ" কথাটির মধ্যে ফেটিশিজম মিশ্রিত।

অতঃপর আমরা এখন মনে করতে পারি যে, তথাকথিত ধর্মভাবনা যুক্তির পরিপন্থী পথে অগ্রসর হয়েছে। পরবর্তী কালে যুক্তিকে খুঁটি বলে আশ্রয় করেছে। এ ভাবনার মধ্যে পরাজয় আত্মসমর্পণ ভয় ক্রোধ মোহ এবং অনুকরণের মতো ইচ্ছা আর ক্রিয়া সততই আছে। প্রবাহিত নদীর মতো মানবজীবনের রূপান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে এই চেতনাও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। আভ্যন্তর উৎস ভয় ক্রোধ যা ছিল তাতে যুক্ত হচ্ছে বাহ্যবস্তুর উপর সেই চেতনার আরোপিত রূপকল্প। প্রতি বস্তুর প্রাণময়তা, প্রাকৃতিক শক্তির তীব্রতার স্বীকৃতি, ভেষজাদি লতাপাতামূলের পরিচিতি—সব নিয়ে এসেছে অ্যানিমিজম; নিষেধাত্মক প্রতিষেধ থেকে এসেছে টোটেম আর ট্যাবু। টোটেম প্রতীকও বটে আদিম মানুষের অথবা আদিম মানবগোষ্ঠীরও। এই টোটেম আর ট্যাবুর পথে এসেছে ধর্মীয় বিধিনিষেধের উপস্থাপনা পরিকল্পনা। এর সাথে-সাথে দেখা দিয়েছে রক্তপাত আর যৌনাচার প্রভৃতি কিছু ক্রিয়া যেগুলি আদিম মানব পরিষ্কার বুঝতে পারত না। বুঝতে পারার সঙ্গে-সঙ্গে আদিম মানব মাটির উর্বরাশক্তি এবং নারীর জননীত্বের শক্তিকে সভয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে। আদিম মাতৃ-কেন্দ্রিক সমাজচেতনার মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছে নানাবিধ স্ত্রীদেবতার পরিকল্পনা—খুব স্বাভাবিক-

ভাবেই তা ঘটেছে। এর মধ্যে পুরুষপ্রধান যাযাবর ও পশুপালক সমাজ (ইন্দো-ইয়োরোপীয় হিট্টি গোষ্ঠী এবং পরবর্তী আর্যগণ) পৌরুষশক্তিচেতনার কারণে অপেক্ষাকৃতভাবে স্ত্রী-দেবতাকে কমই প্রধান্য দিয়েছে। পূর্বোক্ত নিয়মে দেবসমাগম স্বীকৃত হবার সাথে-সাথে দেখা দিয়েছে মৃতের আর জীবিতের জগতে মৃতের প্রভাব নিয়ে কিছু সমস্যা। সেখানেও প্রথমে বুদ্ধি-গম্যতার অভাব থাকায় ইহলোক-পরলোক, মৃতের সৎকার, মৃতের শক্তি আর মৃত্যু-উত্তর অস্তিত্ব (পরবর্তী কালে আত্মা আর জন্মান্তর কল্পনার উৎস) নিয়ে ফেটিশিজমের নানা উপচার দেখা দিল। পরলোকের দেবতারও স্বীকৃতি জুটল। পাপপুণ্য-ফলাফলের কল্পনা এল (যেমন আসুরিস যম ইত্যাদি)। আরও পরবর্তী কালে দেখা দিল পূর্বতর চেতনার মানবগোষ্ঠীর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত লেজেনডারি দেবতাগণ।

এমন জমজমাট অবস্থার সৃষ্টি একদিনে হয় নি। যেমন দীর্ঘ সময় লেগেছে তেমনই সেই সময়ের গণনায় ছোটো বড়ো প্রায় সব উপাদানগুলিই ধরা আছে। যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে যুক্তির ছুরিতে কিছুই কর্তিত বা বর্জিত হয় নি। বরঞ্চ বর্জিত হলে তা ভয়ের কারণ বলে সেটাকে আঁকড়ে ধরারই উপায় খোঁজা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থাটিকে যদি আস্তর বা আভ্যন্তর বলা যায়, দ্বিতীয় অবস্থার স্তরটিতে আস্তর ও বাহির দুটিই সমন্বিত হয়ে রয়েছে—এমন মনে করাই সঙ্গত। সেই প্রাচীনতম চেতনার উন্মেষের কাল থেকে একটা মুগ্ধ চেতনার ধারাবাহিকতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সামাজিক জীবনে সেই চেতনা একটা প্রবল শক্তির রূপে স্থান করে নিয়েছে। সুপ্রাচীন ভীতি আর আসক্তি রূপ নিয়েছে স্পর্শকাতরতার মধ্যে। একান্ত অস্থিরতার মধ্যে মানুষ এই স্পর্শকাতর চেতনায় আশ্রয় খুঁজছে।

আজকের দিনের যুক্তির আলো ফেলেও ধর্মতত্ত্বের সকল দিক স্পষ্ট হবে না। তা সত্ত্বেও বলা যায়: একটা বিশাল মহীরুহের মতো এই চেতনাপ্রবাহ মানবজীবনের খানিকটা দিক নিয়ন্ত্রণ করে আছে এবং আচ্ছন্নও করে আছে। যুক্তির দিক থেকে এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে অধ্যয়ন করতে গেলে প্রায়ই তা ঐকদেশিক হয়ে যায়। যেমন ধর্মাত্মবোধকে শুধুমাত্র যদি মনস্তাত্ত্বিক বলি, তা যথেষ্ট হবে না। অথবা শুধু বাহ্যবস্তুর আরোপিত শক্তির সমার্থক বললেও বোঝা যাবে না। তার উপাদানগুলিতে মীথ, লিজেনড, প্রতীক বা সিম্বল বিচার করা যায় বটে, তাতেও পারাপারের কূল মেলে না। অথচ একটা টোটালিটির ধারণা—সত্য শিব সুন্দর প্রভৃতি বিচিত্র সৌন্দর্যময় শব্দসম্ভার নিয়ে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। বিশ্বাস প্রত্যয় নিয়ে একটা উদ্ভাসের মতো স্রোত মানব তথা সমাজ দুটোকেই পরিপ্লাবিত করে। আবার সেই উদ্ভাস প্রচণ্ড বেগে কালবন্যার মতো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মানবজীবন এবং সমাজপ্রতিষ্ঠাকে প্রায় শেষ করে আনে এবং এক ভয়ঙ্কর তীব্র ক্ষতির পরিচায়ক হয়। এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এখনও মানুষ পায় নি।

সেই না-পাওয়ার পরাজয়কে গত কয়েক সহস্রাব্দ শতাব্দ ধরে মানুষ আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছে। পূর্বোক্ত ধর্মীয় ভাবনার ইতিহাস লিখেছে। উপাদান-গুলিকে যথাযথ বিন্যাস করে ধর্মীয় ইতিহাসের ছায়াময় বনের মধ্যে খানিকটা দূর পর্যন্ত পথ কেটে যেতে পেরেছে। নিষ্ঠুরতাকে যুক্তি দিয়ে চাপা দিতে পরাঙ্মুখও হয় নি। এ ছাড়াও, জীবধর্মের প্রয়োজনে সে উক্ত মালমসলাগুলিকে অর্ধ-ইতিহাস বা লেজেনড বলে গ্রহণ করেছে আনন্দ আর রসমাধুর্যের সঙ্গে; কোথাও বা মীথকে উপস্থাপিত করেছে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মিলিয়ে নিয়ে। প্রাকৃতিক পর্যায়ে শীত আর বসন্তের গমনাগমন, সূর্যের ঋতুচক্র-প্রবর্তনের সঙ্গে মিলিত হওয়া, চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধি—এগুলি এবং আরও এরকম নিয়মিত আবর্তন-বিবর্তনগুলির ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষ তৈরি করেছে আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

অতি সুন্দর কিছু মীথ। মীথ ব্যতীত আছে সিম্বল বা প্রতীক। প্রতীকীকরণের খানিকটা মানবকল্পনা, খানিকটা বাস্তব। বস্তুত প্রতীকীকরণ ধর্ম উপস্থাপনার একটা প্রবল দিক বা আশ্রয় বলা যায়।

এই সমগ্র উপাদানসম্ভার-সহ আজকের দিনের জীবনে মানবমনে জিজ্ঞাসা জেগেছে: স্রষ্টা কেউ আছে কিনা—থাকলে সে স্রষ্টা কেমন—সে স্রষ্টার শক্তি বিধিনিষেধ নীতিবোধ কী ধরনের। বলা দরকার—এর প্রত্যেকটি কল্পনাই অনেক ক্ষেত্রে স্ববিরোধী প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় শক্তি-সহ যুক্ত হয়ে যায় সামাজিক-আর্থ-রাজনৈতিক বোধও কখনও-কখনও। তার ফল দেখা যায় বিদ্রোহে বিপ্লবে যুদ্ধে লোককথায়। এটা আজকের দিনে দুর্বোধ্য নয়। এক-একটা মতবাদ তার শক্তি সংগ্রহ করে ধর্মভাবের থেকেই। আবার স্ববিরোধী যুক্তির অপর দিকটাও আমাদের এখনও যেন সম্মোহিত করে। কোথাও আছে মহা এক শক্তি অনন্ত তার শক্তি, ক্রিয়াকারিত্ব এবং প্রেম। এই অন্তরাতীত প্রাজ্ঞ সত্তার শুভরূপ এবং দক্ষিণমুখ সর্বজনগোচর নয়—এই পক্ষপাতিত্বটুকু এখনও প্রমাণিত করে ধর্মবোধ আর যুক্তিসাপেক্ষতার পারস্পরিক সংঘর্ষ আর বিপরীতমুখীনতা।

যে-সকল মানুষ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যুক্তির উপর নির্ভর করেন, তাঁদের একটি মুশকিল আছে। সকল বিষয়ই তাঁরা যুক্তির আলোকে বা বিজ্ঞানের উপায়ে আয়ত্ত করতে চান। এটা সর্বত্র সম্ভব নয়। আমাদের আলোচ্য ধর্মজিজ্ঞাসার যে স্তরগুলি যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রয়াস করেছি, সেক্ষেত্রে বারবার এই অসুবিধায় নিজেকে পড়তে হয়েছে বলে অনুভব করি—পাঠককেও পড়তে হবে।

পরিগ্রহণ—পর্যালোচনা

আহরণ আর সংগ্রহণ—দুটি পর্বের ছায়াগোধূলি আমরা পার হয়ে এসেছি। কতটা সেটা পরিষ্কার হয়েছে আমার জানা নেই। এখন শুরু করতে চলেছি পরিগ্রহণ-পর্ব। পরিগ্রহণ কথাটার মধ্যেই একটা পর্যালোচনার ইঙ্গিত আছে। পথটা অন্তত যুক্তিকে অঙ্গীকার করে অগ্রসর হবার কথা। এই আলোচনার পথে তৃতীয় চার্টটিকে মোটামুটি অনুসরণ করতে পারি। চার্টটির একদিকে দেখানো হয়েছে মানবসংস্কৃতি-সমাজের রূপান্তরের চিত্র। আর সেই রূপান্তরের চিত্রসংলগ্ন করা হয়েছে মানবসংস্কৃতির অঙ্গীভূত ধর্মজিজ্ঞাসার স্তরভেদ আর রূপান্তর।

যুক্তির নিকষে যেত্রন-যেমন মানুষ তার অস্তিস্কে সমাজ-সংসারে বিন্যস্ত করেছে, তেমনই তার পূর্বে তার হাতে এসেছে কৃৎকৌশল। কৃৎকৌশল দ্বারা মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে সৃষ্টি করেছে, এবং নিজস্ব জীবনে সেই সৃষ্টিপ্রকল্প দিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধতর করেছে। এমন অবস্থায় শুধু খাদ্য পরিধেয় আর আবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তার মধ্য থেকে জাগ্রত হয়েছে তার শিল্পসত্তাও। প্রচলিত ধর্মবোধকে সে যেভাবে হোক মেনে নিয়েছে এবং একপ্রকার শিল্পবোধের মধ্য দিয়েই সেটাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস করেছে। তার যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে এবার ধরা পড়েছে সামগ্রিক ধর্মজিজ্ঞাসার রূপ থেকে রূপান্তর। এগুলি আর পরস্পরবিযুক্ত নয়, বরঞ্চ যুক্তিশৃঙ্খলিত। এটার গতিপথ চার্ট ৩-এ বিধৃত।

এক্ষেত্রে বেশ পরিষ্কারভাবে আমরা যে চার্ট অনুসরণ করেছি, নানা কারণে এটি গ্রহণ করা হয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচলিত পথটি অনুসরণ করে। এ চার্ট প্রচলিত মতের স্পাইরাল থিয়োরি বা টয়েনবির স্টাডিজ অভ হিসট্রি—এ দুটো মতের পূর্ণ অনুসরণ বা অনুকরণ নয়। সোসিয়োলজিস্ট লেভি-স্ট্রাউসের থিয়োরি দিয়েও এই সংযুক্ত চার্টের হদিস মিলবে না। চার্টটির সর্বপ্রথম লক্ষ্য হল দেখা—কিভাবে কেমনভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে ধর্মজিজ্ঞাসার উদ্ভাবনা জড়িয়ে মিশিয়ে আছে। পড়তে-পড়তে বা ভাবতে-ভাবতে যেসব বিষয় হাত

থেকে ছিটকে যায়, চার্টের বা চিত্রের বন্ধনে তার একটা আপাত-স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। এইটুকু ব্যাখ্যা মনে রেখে এবার আমরা অগ্রসর হতে পারি।

প্রিমিটিভ কমিউনিজম একটা আদ্যমানিক স্তর। এই স্তরের মানুষের সময় যেত খাদ্যান্বেষণে। প্রথমে হয়তো একত্র জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত ছিল না। তারা অসহায়, অরক্ষিত—ভয় পেত নিজের ছায়াকেও। কারও মতে, তারা জৈব প্রয়োজনে একত্র থাকতে শেখে। অপর দিকে, বিকাশবাদী বা ইভলিউশনবাদীদের মতে, একত্র বাসের প্রবণতা মানুষ তার পূর্বজ প্রাণীদের গ্রিগেরিয়স ইনস্টিংক্ট থেকে পেয়ে থাকবে। আমাদের মতে, শেষোক্ত মত সমীচীন মনে হয়। এই স্তরে খাদ্যসংগ্রহে সময় কাটত। এ জনস্তরে কিছু মানুষ আজকের দিনেও রয়ে গেছে। সুতরাং সঙ্গত কারণে মনে হয় যে এদের মধ্যে জীবন যাচাই করা বা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগতে পারে নি। ভয় আর অসহায়তা, বিমূঢ়তা আর অরক্ষিত অবস্থা তাদের অজানা ছিল না—এইমাত্র বলা যেতে পারে। কোনো-কোনো লেখক কল্পনা করেছেন—নিজের ছায়াকে তারা ভয় পেত, এটাকে দ্বিতীয় সত্তা ভাবত। ছায়াটা অন্ধকারে থাকত না, আবার আলোর তারতম্যানুসারে ছায়াটা যে ছোটো-বড়ো হত—এটা লক্ষ করতে তারা ভয় পেত।

যদিও প্রথমেই বলেছি যে, চার্টটা ঠিক সম্পূর্ণভাবে টয়েনবির অনুসারী নয়, তবুও সে মতের একটু সংশোধন এখানে করি। যদি এই চার্টের কোনো বিশেষ মতের সঙ্গে যোগ দেখা বা লক্ষ করা যায়, তবে তা টয়েনবির সাথেই আছে। কারণ মানব-জীবনে আর -মননে যে শক্তি আর উপাদানগুলি একত্র সক্রিয় হয়, তারা তো একত্র লোপ পায় না। আবার, নেচার অ্যাভরস ভ্যাকুয়ম—এ নীতি মানলে বোঝা যায় এক কোনো বিশিষ্ট মতের আশেপাশে বড়ো গাছের ছায়ায় আবির্ভূত প্রাণের মতো অনেক গাছপালা, শিকড় আর প্রাণীর আবির্ভাব আর তিরোভাব একই সাথে ঘটতে থাকে। মানবজীবনটার রূপ এমনই একটা জটিল অবস্থা যে তাকে চুলচেরা বিচার করা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে দ্রুত আগমন আর নির্গমন, দুটো সক্রিয় গতি একই সাথে কাজ করতে পারে মনে করা সঙ্গত বিবেচিত হয়।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে প্রথমাবস্থায় প্রিমিটিভ কমিউনিজমের যুগে ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল কিনা তার নির্ণয় না হলেও দ্বিতীয় অবস্থায় বা অসভ্য যুগে বা স্যাভেজরি যুগে দেখা দিল। এই কালটা দীর্ঘস্থায়ী বলে এর তিনটা স্তর কল্পনা করা যায়—এগুলি আদিস্তর, মধ্যস্তর আর অন্ত্যস্তর ধরা যাক। মানবমননের আকাশে বাতাসে সর্বত্র প্রাণপূর্ণতার কল্পনা। নাম-না-জানা ভয়, অনামী শক্তির সর্বত্র দেখা মিলছে। প্রাকৃতিক শক্তি, গাছলতাপাতা-পাথরের শক্তি, আকাশবাতাসের বজ্রবিদ্যুৎঝড়ের শক্তি, গুহার অন্ধকার, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ—সবই ভয়াবহ। এর সঙ্গে আছে জন্মমৃত্যুরক্তপাতের অকূল রহস্য। মানুষের মুখে তখন এসেছে ভাষার প্রকাশব্যঞ্জনা। মানুষ অগ্নিকে আয়ত্তে এনেছে। যা ছিল প্রয়োজন, তাকে আয়ত্তে আনার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছে তখন। নবলব্ধ জ্ঞান-কৃৎকৌশল-সহ সে একটা বা বহু শক্তির উৎসকে কল্পনা করে নিয়ে তার সঙ্গে ঐকান্তিকতার একটা গৌরববোধও করে থাকতে পারে। পূর্বেকার উক্ত ধর্মীয় উপাদানগুলিকে যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে সে মানুষের পক্ষে। এই স্তরটিতে অর্থাৎ অসভ্য যুগের ধর্মভাবনাকে একত্রিত করে নিয়ে আমরা একটা নাম দিলাম—পলিথীইজম বা বহুদেববাদ।

বহুদেববাদ

নামটির অর্থাৎ যুক্ত শব্দটির নির্গলিত অর্থ হল অনেকদেবতাসম্বন্ধীয় মতবাদ। বস্তুত, ধর্মমতবিচারের সর্বপ্রথম ধাপটি এই বহুদেববাদ নিয়ে শুরু। যত

রকম শক্তি আছে তত রকম দেবকল্পনা উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব। পূর্ব আর পশ্চিম গোলার্ধের প্রাচীন জাতিগুলির মধ্যে সর্বত্র এই বহুদেববাদ দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও আছে বলা যায়। তবে বর্তমানে বহুদেববাদ থাকলেও সেটা আর অত প্রত্যক্ষীগোচর হয় না—নানা মতবাদ আর সমালোচনায় চাপা পড়ে গেছে। বহুদেববাদ ব্যাপকভাবে দুই পর্যায়ের সংস্কৃতি-স্তর পরিব্যাপ্ত করেছিল। এ দুটি স্তর হল অসভ্য যুগ এবং বর্বর যুগ। পৃথিবীর জলস্থলের যে বিভাজন বর্তমানে দেখছি সেই হিসাবেই এই বহুদেববাদ অবলোকন করা চলে। অসভ্য যুগের দেবতারা উগ্র, নিষ্ঠুর, জিঘাংসাপ্রবণ, প্রতিহিংসাপরায়ণও বটে। পূর্বেই বলে এসেছি যে, নিজের অন্তরসম্পদ আর চেতনার বিভিন্ন স্তরবিভেদ অনুযায়ী মানুষ দেবতার কল্পনা করে থাকে। সুতরাং স্তাভেজের দেবতা স্বয়ং-স্বতন্ত্র এক স্তাভেজ বলা চলে। এক কথায় যাকে কাঁচাখেকো বলা যায় তাই। হিংস্র চেহারা, পশুর মতো মুখ আর ব্যাদিত চোয়াল—বিরাট বিশাল পাথরের অথবা কাঠের মূর্তি। এমন অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের লোকরা, ক্ষীয়মাণ আমেরিনডিয়ান উপজাতি, তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু শাখার অনুন্নত বহু সম্প্রদায় যারা ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে নি, ভারতীয় মানুষ—এদের সকলকেই আমরা এখনও বলতে পারি কোনো না কোনো প্রকারের বহুদেববাদের সমর্থক পূজক।

প্রাচীন মেক্সিকোর সভ্যতায়, ইনকা সংস্কৃতিতে, পেরুদেশের সভ্যতায় আমরা বহুদেববাদের সাক্ষ্য পাই। মেকসিকোর ওই প্রাচীন দেবদেবীগণের (তারা যাদেরই মানসকল্পিত হোক) প্রায় বহুদেববাদের অন্যত্র পাওয়া রূপের সঙ্গে মিল আছে। এতে করে মনে হয়, মানুষের দিনচর্যা এবং দিনযাপনের মধ্যেও খানিকটা স্বাজাত্য থাকা সম্ভব। সেই কারণে, বজ্রের দেবতা, পৃথিবী-দেবতা, আকাশের দেবতা, শস্যের দেবতা, পুত্রকন্যার দেবতা, পশুর রক্ষক দেবতা—এগুলি সর্বত্র প্রায় একরকম। মানুষ তার পার্থিব সম্পদকে বুঝে, তার রক্ষক খুঁজে, এসব দেবতার সৃষ্টি করেছে। সূর্যদেব চন্দ্রদেবী অনেক দেশে একরকম। (ভারতীয় কল্পনায় সূর্য পুংলিঙ্গ, চন্দ্র নপুংসক লিঙ্গ : ব্যাকরণ তাই বলে।) সূর্য দেব, নদী দেবী, ধরিত্রী দেবী। ফলশস্যপুষ্পাদির অধিষ্ঠাত্রী কোথাও-কোথাও চন্দ্রও পাওয়া যায়। আইসিস-ওসিরিস মীথটি বার্ষিক শস্যোৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আইসিস প্রেমদেবতাও বটে। ক্যুবিলিস কুমারী ধাত্রীদেবতা। সম্ভবত পরবর্তী কালে প্রাপ্ত কুমারী জননীর কল্পনাটি খ্রীষ্টধর্মে আইসিস ও ক্যুবিলিসের থেকে গৃহীত হয়ে থাকবে। বৃষ বা বৃষকল্প সর্পদেবতা প্রাচীন আফ্রিকা ও ক্রীটে বর্তমান ছিল। প্রাচীন গুহাগর্ভে সংলগ্ন কোনো হিংস্র প্রাণীর কাছে হতভাগ্য মানুষকে বলি হিসাবে জীবন্ত প্রেরণ করা হত। অনেক আদিম অধিবাসীর মধ্যে (পূর্ব-ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে) প্রতি মানুষেরই রক্ষক-দেবতা কল্পিত হয়ে থাকে। এভাবে দেখে-দেখে আমরা প্রথমে একটা সিদ্ধান্তে আসি—সে সিদ্ধান্ত হল : প্রাচীন বহুদেববাদ উত্তরকালে বিবর্তিত হয়ে কতকগুলি মুখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। যেমন দেখা যাবে প্রায় প্রতি অনগ্রসর বা প্রাগ্রসর বহুদেববাদের মধ্যে ধীরে-ধীরে ছোটোখাটো শক্তিগুলি আর তেমন সমাদৃত হচ্ছে না। মূল কতকগুলি শক্তিই দেবতা বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। অবশ্য বহুদেববাদের বিক্ষিপ্ত রূপ তখন সংক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। চন্দ্র, সূর্য, বরুণ, অগ্নি, প্রজননদেবতা, গৃহদেবতা (Domboy শ্লাভ, Daimyojin জাপানি) প্রভৃতি প্রধান-প্রধান দেবদেবী এগিয়ে এসেছে। এমনতর চিত্র বহুদেববাদের অন্তর হতেই বার হয়ে এসেছে বলা যায়। সব প্রাচীন জাতির দেব-ইতিহাস প্রায় একই রকম। স্থির ইতিহাস না পেলেও বহুদেববাদের আধারীভূত সমাজ-জীবন

অসভ্য যুগ এবং বর্বর যুগ পর্যন্ত প্রসারিত—এ কথা আগেই বলেছি।

বহুদেববাদ আদিম মানবজীবনের কল্পনার এক-প্রকার সংক্ষিপ্ত রূপ বলে ধরা যাক। মানুষ তার বাহ্য পরিবেশ এবং অন্তরস্থ চেতনার সাক্ষী হিসাবে সতত প্রয়াস করে চলেছে একটা বুদ্ধিযুক্ত শৃঙ্খলা দিয়ে সমস্ত কিছু ঘটনা অবলোকন করতে এবং আত্মস্থ করতে। তার সেই প্রয়াস এই ধর্মীয় জীবনের ইতিহাসেও ধরা পড়েছে মনে করা যেতে পারে। বহুদেববাদের পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে-ধীরে জাগ্রত হয়েছে কয়েকটি মতবাদ।

মানাইজম

এর মধ্যে একটি হল আফ্রিকীয় মানাইজম। অন্যটি হল প্রাচীন ঈরানীয় ডাইথীইজম। আরেকটি হল প্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর প্যানথিয়নের পটভূমিতে উদ্ভূত ভারতীয় বৈদিক আর্যদের চিন্তায় প্রতিফলিত হেনোথীইজম। মনে রাখতে হবে—এ তিনটির আধার কিন্তু বহুদেববাদই। অপরাপর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বহুদেববাদের পটভূমিকায় প্রাপ্ত প্রধানদেববাদত্ব। এই বিশিষ্টতা পাই মেসোপটেমিয়ার প্রধান দেবতা মারডুকের কল্পনায়, ঈজিপ্ট-মিশরের প্রধান দেবতা আমন-রা বা সূর্যদেবতার কল্পনায়, এবং গ্রীকো-রোমান প্যানথিয়নে পাই দেবদেব জিউস অথবা দেবরাজ জুপিটারের মধ্যে। এ-সকল দেবদেব অবশ্যই স্বর্গচারী সুখী দেবযোনি। তবে মর্ত্যে তাদের গমন আগমন অবারিত। তাদের মন্দির, পূজাবেদী, বলিগ্রহণ, নারীভোগ (প্রকৃত ক্ষেত্রে পুরোহিত দেবতার প্রতিভূ হয়ে ভোক্তারূপী) তাদের চরিত্রগত। বৈদিক ইন্দ্রও দেবরাজ এবং পার্থিব নারীর প্রতি আকৃষ্ট। এ ছাড়া, বহুদেববাদের আরও একটা অংশে পাই অজস্র ধরনের দেবতাত্মা বা দেবযোনিভুক্ত অস্তিত্ব। নিম্ফ্, ড্রায়াড, অপ্সরা, জিন, হুরী, পরী—এরা সংখ্যায় অগণিত। দেবসমাজেও রাজা-প্রজা থাকে—রানী, দাসী, অপ্সরা, স্বর্গবৈদ্য, মিস্ত্রিদেবতা (ভালকান-বিশ্বকর্মা)—বিশিষ্ট কর্মীরা স্ব-স্ব কার্যে লিপ্ত থাকে, অধিকারী দেবরাজের সন্তোষবিধানে তৎপর থাকে। জোড়া দেবতাও থাকে—যেমন ক্যাস্টর ও পোলকস (তারাদ্বয়) এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়। স্বর্গ, জন্নত, বেহেশত, জাহান্নাম (নরক) প্রভৃতির কল্পনা পাপপুণ্যের বিধানে নিয়ন্ত্রিত হয়। তবে কে কোথায় যাবে সেটা প্রায় নির্ভর করে দেবাদিদেবের বিধানের উপর।

আরব ভূখণ্ডের শুষ্ক রুক্ষতার মধ্যে ছোটো-ছোটো জাতি বাস করত। সেইসব নুকুলের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল—বহুদেববাদের মধ্যেও এক সর্দার বা বীর দেবতার কথা ভাববার। তবে ঠিক বলা যায় না যে এ চিন্তাটা আফ্রিকাতে বা আরবে কোথায়, কখন এবং কেন উদ্ভূত হয়। মাঝখানের বিশৃঙ্খল চিন্তার ইতিহাস খুঁড়ে তা বার করা আজ অসাধ্য। এগুলির তখনও একেশ্বরবাদের রূপলাভ ঘটে নি—এইমাত্র বলা যায়। বহুদেববাদের কল্পনায় দেবতারা স্বপ্রধান। একেশ্বরবাদ সম্পূর্ণ অন্য জাতীয় চিন্তার ফসল।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা মানাইজমের অর্থ করি—একটা কোনো প্রধান শক্তির কল্পনা যেন মানবমনে ছায়া ফেলেছে। মানা মানেই মহা এক শক্তি; কতকটা যেন পরবর্তী কালের আল্লেহ্ (জুইশ), বা অলমাইটি, আল্লাহ্ (ইসলাম) এবং পরব্রহ্ম (হিন্দু আর্য-দ্রবিড়) প্রভৃতির কল্পনার সঙ্গে এই মানার তাৎপর্য মিলতে পারে। এইভাবে মানাইজম দিয়েই আমরা সহজে বুঝতে পারি—একেশ্বরবাদ কিন্তু প্রকৃতই আফ্রিকীয় তথা সেমেটিক-হেমেটিক নুকুলের চিন্তা থেকেই প্রসূত। হেমেটিক দেবগণ (আমন রা প্রভৃতি) আমাদের অজানা নয়। প্রাক্-আরব সন্তান-দের এবং জুইশ নুকুলেরও দেবতা-প্রধানের নাম আমরা

জানি বাল বা বল। আরও কিছু ছোটোখাটো দেব-দেবীর পূজা নিশ্চয়ই হত। হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাবের আগের সে ইতিহাস খানিকটা খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল। তারও আগের দেবদেবীদের সঙ্গে খ্রীষ্টজগতের জননী মেরীকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এমন অনুমান হয়।

মানাইজমের অর্থ তাহলে দেখছি ঠিক দেবতা নয়, বরঞ্চ একটা শক্তি। কংক্রিট থেকে এই অ্যাবস্ট্রাকট কল্পনার যে রূপান্তর—এই বিশিষ্টতা মানবচিন্তার একটা সমৃদ্ধ ফসল বলা যেতে পারে।

দ্বিদেববাদ

এমনই আর-একটা দিক হল ডাইথীইজম বা দ্বিদেববাদ। আমি নিজে ঠিক এই কল্পনা সহজে মেনে নিতে পারি না। এর মধ্যে কোথাও একটা ন্যায়ের ফাঁকি আছে দ্বিচন্দ্রদর্শনদোষের মতো। তবুও ধর্ম-ভাবনার ইতিহাসে এ প্রয়াসটাও লক্ষ করার মতো নিশ্চয়ই। প্রাচীন ইন্দো-ঈরানীয় নুকুল ইন্দো-ইয়োরোপীয় হিট্টি নুকুলের একটা বড়ো শাখা। বস্তুত, পশ্চিম এবং পূর্ব ইয়োরোপের দেবসমাজ, ঈরান-হিন্দুস্তানে প্রাপ্ত দেবসমাজ আর বহুদেববাদ একই উৎস থেকে নিঃসৃত। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলন, নানাবিধ উপকরণ ও বলির ব্যবস্থা, তুচ্ছ বৃহৎ নিয়মাদি এবং কল্পিত বহুদেববাদ ঈরান-দেশেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু যে কারণেই হোক এখানে সুনীতি-কুনীতির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও সেই সংঘর্ষজাত শুভশক্তির জয়—এই সত্যটাই প্রকটিত হয়। অনেক দেবতার মধ্যে প্রধান হলেন অহুরমজ্‌দ (সংস্কৃত অসুরমহৎ)। অসুঃ শব্দ শ্বাস- বা প্রাণ-বাচক সংজ্ঞা নির্দেশ করে। এক মহাপ্রাণ শক্তিই সেই অহুরমজ্‌দ। তিনি শুভ শক্তি। মানবমননে এই শুভশক্তি আরও আটটি শক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হন। ওই আটটি শক্তি কতকটা হিন্দু প্যান্থিয়নের অষ্টবসুর মতোই। এই মহাশক্তির প্রতিস্পর্ধাকারী অশুভ শক্তি হল অহ্রিমান। এই শক্তির সর্পিল রূপ পরবর্তী কালের সর্পরূপী ডেভিল দিয়াবল বা শয়তানের রূপ নিয়ে থাকবে। মানবমননে অহোরাত্র এই অহুরমজ্‌দ ও অহ্রিমানের দ্বন্দ্বসংঘর্ষ বর্তমান। এই সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটে শুভ শক্তির হাতে। মনীষী জরদুষ্ট্র এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর নামটির অর্থ জরৎ + উষ্ট্র বা গোল্ডেন ক্যামেল। জরৎ কথাটি অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ হিসাবেও ধরা যেতে পারে। আবার, পূর্ণবয়স্ক শক্তিমান একটি উষ্ট্র স্বীয় শক্তিমত্তায় মরুভূমি পার করতে পারে। সেইরকম গুরু জরদুষ্ট্রও স্বীয় শিক্ষাগুণে মানবমঙ্গল-বিধানে তৎপর হন। এই কল্পনার মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ নুকুলের সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করা যায়। এই নুকুলের অপর বৈশিষ্ট্য হল তাদের নীতিগত অনুভূতি। শুভশক্তিই দেবশক্তি—অশুভশক্তি দেবদ্বেষী শক্তি। দেবশক্তির কাছে অশুভ শক্তির পরাভব হল এই মতে ধর্মীয় জীবনের পারিপাট্য। ধর্মের ইতিহাসে এ কল্পনা নূতন একটা মাত্রা যোগ করেছে বলা যায়।

তা সত্ত্বেও পাঠক আমারই মতো বিচার করে যেন দেখেন যে, এটা যথার্থ দ্বিদেববাদ বলে অভিহিত হতে পারে কিনা। পরাভূত শক্তি কি দেবদেবের মতোই প্রবলশক্তি ধরে? এই প্রশ্ন রয়েই যায়। সেজন্য অনেকেই দুটি শক্তিকে সমার্থক ধরেন না। তাঁদের মতে শুভবাচক শক্তিই একমাত্র শক্তি এবং বহুদেববাদ থেকে একেশ্বরবাদে অভিযানের পথে এই দ্বিদেববাদের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বমুক্তির কল্পনা একপ্রকার সিঁড়ি মাত্র। বলা প্রয়োজন যে, মানাইজমের মতো এই দ্বিবেদ-বাদের বা ডাইথীইজমের পশ্চাৎপট হল বহুদেববাদই।

মানাইজম আর ডাইথীইজম বাদে অন্য যে শব্দটি মনে আসে তা হল হেনোথীইজম। এটি বিশেষ ভাবে বৈদিক আর্য-ধর্মশাস্ত্রোক্ত দেবতাদের একীকরণের একটা প্রয়াস বলে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। আমরা পূর্বেই বলেছি—ইন্দো-ইরোয়োপীয় হিট্টি নুকুল ঈরানে উপনিবিষ্ট হয়—তাদের (ভাষাগত)

কেন্তুম শাখাটি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বসতি স্থাপনা করে। সঙ্গে যায় তাদের ধর্মমত আর বীরগাথা। সতম শাখাটি রইল আর্মেনিয়াতে, আলবেনিয়াতে ও ঈরানে। ঈরানে বসবাসকারীদের মধ্যে কোনো সময় একটা স্থায়ী সংঘর্ষ ঘটে। তার ফলে এক শাখা বহির্গত হয়ে হিন্দুকুশ পার হয়ে ভারতবর্ষ তথা জম্বুদ্বীপে চলে আসে। ভাষাগত যোগ রয়ে গেলেও অর্থ অনেক সময় পরিবর্তিত হয়ে গেল। বিশেষ করে ধর্মীয় শব্দ। অহুরমজ্‌দ (সংস্কৃতে মহদাসুর) ঈরানে শুভ দেবশক্তি। এই তাৎপর্য বদল হল আর্য বৈদিক শব্দে। অসুর কথাটা অপার্থক হয়ে দাঁড়াল। হিন্দ-এ আগত আর্য মতে দেব কথাটা রইল। শব্দ আর অর্থ দুটোই প্রাচীন। (তুলনীয় কেন্তুম শাখায় ডিভাইন এবং সতম শাখায় দিবা বা উজ্জ্বল।) ঈরানীয় আর্য তৎক্ষণাৎ দেব (দ এর এখানে শব্দের সঙ্গে স্বর যোগ হয় না—পৃথক থাকে যেমন সোম হওম) শব্দটির অর্থ করে নিল শয়তান বা ডেভিল। (দিয়াবল, ডাইয়াবলিক)। অর্থাৎ দেব-শক্তির বিরূপকল্পনা সহ জেন্দ আবেস্তা এবং বেদ শব্দার্থে পার্থক্য ঘোষণা করার ফলে দুই নুকুলের বৈরিতার আভাস রয়েই গেল। বৈদিক যুগে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ, বৈদিকোত্তর পৌরাণিক যুগে কথিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব এই অর্থে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা হিন্দ আর্য বৈদিক দেবতাদের কথা আলোচনা করব। এখানেও সেই বহুদেববাদ। এসব দেবতারা নানা প্রাকৃতিক শক্তি এবং অগ্নির সঙ্গে সমপৃক্ত। আদি আর্যগণ দীর্ঘকাল বসবাস করে থাকবে সেই কার্পেথিয়ন পর্বতমালা থেকে বিস্তৃত কাসপিয়ন সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে। এসব স্থানই (এখনকার মতো) প্রাকৃতিক তৈল ও গ্যাসের সম্পদে উজ্জ্বল। সম্ভবত আগুনও লেগে যেত। এই আর্য পশুপালক যাযাবর জাতির শাখা ছিল অতি বীর্যবান এবং কল্পনাপ্রবণ। পশুমাংস, বিশেষ গোমাংস ঘোড়ার মাংসই ছিল তাদের আহার। শূল্যপক্ক এই মাংস ব্রীহীযব বা বার্লির পুরোডাশ (পরোটা জাতীয়) সহ তারা ভোজন করত। একত্র এই ভোজন হত অগ্নির চারপাশে বসে—গান গেয়ে। অতি ভীমকর্মা এই বর্বর লোকেরা ভাঙ বা ক্যানাবিস ইনডিকা থেকে প্রাপ্ত পানীয়াসক্ত ছিল। প্রাকৃতিক শক্তির বন্দনা-গান সুরযোগে গাওয়া হত; উদগাতা ঋষি—ধ্যেয় দেবতা কোনো একজন। নুকুল নৃত্যগীতপটু ছিল—স্ত্রীলোকও সুরায় আসক্ত ছিল। রথপ্রতিযোগিতা ও পাশাখেলা তাদের ব্যসন ছিল। (যেমন মহাভারতে দেখা যেত।) ঈরানে থাকা কালে সম্ভবত তারা গাভী বা গবি কথাটা শেখে—সুমেরীয় শব্দ গু। (কাউ কথাটিও তারই বাচক।) এই গোখাদক জাতি লৌহাস্ত্রের (তরবারি) নির্মাণ ও ব্যবহার জানত। আনাতোলিয়ার হিট্টি শাখার নুকুল ঘোড়ার পালন, প্রশিক্ষণ জানত। ভারতে আগত আর্যগণ ঘোড়ায় চড়ে হাতে তরবারি নিয়ে আসে। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তারা প্রথম আসে—উত্তর-পশ্চিম ভারতে তখন প্রত্ন দ্রবিড় সভ্যতা—যাকে আজ আমরা হরপ্পা-মোহেনজোদারো সভ্যতা বলে চিহ্নিত করি। তাদের উন্নততর নাগরসভ্যতা, পুরনগরী, ব্রোঞ্জ অস্ত্রের ব্যবহার সহ তারা এই আর্যদের দ্বারা স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হল এবং আর্যেরা তাদের দেবদেবীকে গ্রহণ করল।

১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমাগত এই বর্বর পশুপালক নুকুল উত্তর-পশ্চিম ভারতে উপনিবিষ্টহল। মোটামুটি তারা ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী পাঁচশত বৎসরে বেশ ভালভাবে এদেশের মাটিতে আর অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যায়। সেই মিশ্রণের চেষ্টা ফলবতী হতে দীর্ঘদিন লেগেছে। সেই প্রয়াসের একটা দিক, একটা সমন্বয়-প্রয়াস মহাভারতে লক্ষিত হয়। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই আর্যদের কথা বলতে হল। কারণ পরিশেষে তৎকালের ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে প্রত্ন-দ্রবিড়,

দ্রবিড়, অস্ট্রালয়েড এবং কিরাত তথা সুপ্রাচীন নিগ্রইড কুলের লোকেরাও এদের সঙ্গে মিলেমিশে এক মিশ্র-নৃকুল, মিশ্র-সংস্কৃতিসভ্যতার সৃষ্টি করে। সমাগত আর্য দেবদেবীগণেরও নানারকম পরিবর্তন হয়। পূর্বেই বলেছি কোনো বিরোধী পক্ষই দেবদেবী-গণকে উপেক্ষা করতে পারে না। বৈদিক আর্য দেবদেবী পুরাতন ইন্দো-ইয়োরোপীয় হিট্টি জাতির ঐতিহ্যধারায় প্রাপ্ত দেবদেবী সহ যুক্ত হল রুদ্র+শিব, বিষ্ণু+কৃষ্ণ এবং আরও অনেক পুরাতন যুগের মীথ ও লেজেনড থেকে প্রাপ্ত দেবদেবীগণ। রুদ্র (রুদোই রুদিন—শ্লাভ নাম) সম্ভবত ঝড়ের দেবতার লাল রঙের মেঘরূপী আবির্ভাব। এটা পশুপালকদের কাছে ভয়ের। তার সঙ্গে যুক্ত হল কিরাতবর্গীয় শিব এবং অষ্ট্রিক নৃকুলের বোঙ্গা বা ভূতপ্রেতের অধীশ্বর। এমন সিনক্রেটিক চিত্র দেবদেবীদের এ ভারতে পাওয়া যাবে—যা এখনও ধরতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীনতর আর্যদের উচ্চারিত ও মুখে-মুখে শ্রুত ও স্মৃতিধৃত বেদসাহিত্যে বহু ঋষি ও দেবতার নামও পাওয়া যায়। তাতে সমাজচিত্রও যা পাওয়া তা খুব ধর্মভাবাপন্নও মনে হয় না। এগুলি কিছু পরিমাণ সহজলভ্য বলে আলোচনা করার সুবিধা আছে। ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিসহস্র ঋক। এর কিয়দংশ গীত হত, সেটুকু সাম। যজ্ঞবিধিতে প্রযুক্ত সূক্তগুলি নিয়ে যজুর্বেদ। অথর্ববেদ মনে হয় জীবনধারণের অজস্র উপাদান এবং তাদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে লেখা। চিকিৎসা, সর্পমন্ত্র, ঔষধ, ভূততাড়ন এসবই সেখানে পাওয়া যাবে। আমাদের মনে হয় অথর্ববেদ অনেক বেশি প্রয়োগকল্প ও প্র্যাকটিক্যাল।

পূর্বোক্ত ঋগ্বেদের সূক্তগুলির উদ্‌গাতা ঋষিরা (কেউ মহিলাও আছেন) বেশ জাগতিক ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁদের চাওয়া কিন্তু খুবই সাধারণ। বেশির ভাগই প্রার্থনা একেবারে অতি সাধারণ সুবিধা প্রার্থনা। অগ্নির কাছে প্রার্থনা যেন তিনি দেবতাসকাশে প্রার্থনা পৌঁছে দেন। ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা যেন প্রার্থীর পেয়জল সুস্বাদু হয়—শত্রুর পানীয় বারি যেন ক্ষারযুক্ত ও অপেয় হয়। মোটের উপর আমরা যেন ভাল থাকি, অন্যরা যেন কষ্ট পায়। স্ত্রী-ঋষিদের প্রার্থনা পতির এবং প্রেমিকের সঙ্গে সম্যক দৈহিক সম্ভোগ ও পরিতৃপ্তি প্রার্থনা এমনও আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতর যে সূক্তগুলি সেগুলি অতি স্পষ্ট ও সহজ। বস্তুত দশম মণ্ডলের দিকে সূক্তগুলি সাজানোর ফলে একটা দার্শনিক তাৎপর্য বার হয়ে আসে—একদেব না হলেও কোনো পরমদেব বা বিরাট পুরুষের তা একক কল্পনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি বৈদিক যুগের প্রাথমিক সুর নয়। মণ্ডলগুলি কী ভাবে কে সাজান, তা আমরা খুব নিশ্চিত নই। কিন্তু প্রথম দিকের মণ্ডলগুলিতে বিশ্বদেব কথাটা পাওয়া যায়! অনেকগুলি বিশ্বদেব-সূক্ত আছে। স্বভাবত বিশ্বদেব কে বা কারা? কথাটার অনুবাদ করা হয় ইউনিভার্সাল ডিইটি বলে। বিরাট পুরুষ অথবা সর্বব্যাপী বিষ্ণু (নীলদেব দ্রবিড় দেবতা ভেণহু) এবং বিশ্বদেব এক নয়।

তাহলে এই বিশ্বদেব কে বা কারা? এইখানে পূর্বোল্লিখিত হেনোথীইজমের কথাটা উল্লেখ করা চলে। মনে হয়, বৈদিক আর্যগণ কোনো এক শক্তিকেই প্রতিটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনুপম দেবতাদের মধ্যে দেখতে চেয়েছে বা পেয়েছে। যে শক্তি জলে, তপনতেজে, অগ্নিতে, মাটিতে, শস্যে, ফুলে, ফলে তাই বন্দনীয় প্রস্তুত অন্নে। (আচমনপ্রথা দ্রষ্টব্য।) সেই অন্নশক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে দেহে এবং মনীষায়। অর্থাৎ একই শক্তি ঘুরেফিরে আসছে। অন্ন প্রাণ মন বিজ্ঞান ও আনন্দ—সবই এইভাবে একত্র সংবদ্ধ।

পরিশেষে আমরা এই ভাবে পলিথীইজম থেকে বিভিন্ন নৃকুলের মধ্যে পাই মানাইজম ডাইথীইজম এবং হেনোথীইজম। বলা অসঙ্গত হবে না যে এই মধ্যস্তরগুলির নির্দেশে আমরা এসে পৌঁছই মনোথী-ইজম বা একেশ্বরবাদের কল্পনায়।

[পরের কিস্তি জুন সংখ্যায়]

অবৈধ

মীনাক্ষী ঘোষ

কবির সাথে আমার নাকি প্রেম আছে; লোকে বলে। আমাদের দেশে তো অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুত্ব-সম্পর্ক স্বীকৃত নয়। নায়ক-নায়িকা বিবাহিত হলে তাদের সম্পর্ক বৈধ, অবিবাহিত হলে অবৈধ। ব্যাস, এর উপর আর কথা নেই। শ্রীরাধার আমল থেকে সেই একই ব্যবস্থা কায়েম। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি আর প্রথা সবই তো প্রাচীনত্বের গৌরব দাবি করতে ব্যস্ত; পুরাতনীর গৌরবেই আমরা বাঁচতে ভালোবাসি। অতএব প্রথাসিদ্ধভাবে কবির সাথে আমার অবৈধ প্রণয়। তাতে জনতার মনে কোনো দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশই নেই। শুধু আমারই মনে যত দ্বন্দ। মাঝে-মাঝেই ভাবি প্রেম মানেটা কী? প্রেম মানে কি সঙ্গলাভের ইচ্ছা? তা, কবির সঙ্গলাভের ইচ্ছাটা আমার মধ্যে যথেষ্টই আছে। কবিকে ছাড়া দুটো দিন চলে না। কিন্তু তার মানেই কি প্রেম? নাকি প্রেম মানে বিছানা, নিদেনপক্ষে একটি চুমু? কিন্তু কোনোদিন যে কবির হাতটাও ধরে দেখা হয় নি—তাতে পৌরুষের অটল-উদার-বিস্তৃত সুগন্ধ আছে কিনা। এমনকী এ পোড়া মনের কোনায় সে ইচ্ছা-টুকুও কখনো উঁকি মারে না। আসলে ওসব ধরাধরির সাধ একশ এক পার্সেনট পূর্ণ হয়ে গেছে বিবাহিত জীবনে। আমার যে বজ্জর মতো স্বামী আছে। লোকে বলে বজ্জর মতো স্বামী থাকতে মোহনার এ কেমন দুর্মতি? এমন স্বামী ছেড়ে ওরকম একটা ম্যাড়ম্যাড়ে পুরুষের প্রেমে ও পড়ল কেমন করে? প্রতিবেশিনীদের ভারি বিতৃষ্ণা আমার প্রতি। গত-কাল সন্ধ্যায় আমাদের ব্যালকনিতে আমি আর কবি যখন চায়ের কাপে কবিতা দোলাচ্ছিলুম, তখন সামনের ব্যালকনিতে, একজোড়া দরজা সমুদ্রের গর্জনকে হার মানিয়ে সপাটে চোখ বন্ধ করে আমাদের সম্পর্কে আপত্তি জানাল। সেইদিকে চেয়ে আমি হেসে বললুম, 'কবি, বন্ধ দরজা নিয়ে একটা কবিতা বানাও।'

কবি অমনি বলল,

'জোয়ারি সমুদ্রের অবিরত উদ্দাম করাঘাত,
তবু বন্ধই থেকে যায় দোর।
বালির কাঁচুলি যেন দ্রৌপদী-আবরণ
হার মেনে ফিরে যায় ঢেউয়েদের নখ।'

—বাঃ বেশ। এখুনি বানালে?

—না, না। কালরাতে সমুদ্র দেখতে-দেখতে লিখেছিলাম। আমি কি তোমার মতো জাদুকরী, যে বলামাত্রই কবিতা বানিয়ে ফেলব?

—চটপট লিখতে পারলেই কি কবিতা হয়, কবি? আমার তো মনে হয় যেন কিছুই লিখতে পারি না।

—তোমার মধ্যে জাদু আছে মোহনা। তুমি লিখে যাও। সার্থক সাহিত্যিকের সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এই হল আমাদের প্রণয়ভূমি। সাহিত্যচর্চার মধুতে আমরা দুটি অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষ জমে থাকি প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই। বজ্র তার কর্মজীবন নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তবু কদাচিৎ যোগ দেয় আমাদের আসরে। বজ্র কবিতা বোঝে না, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে বোঝে। প্রতিবেশীদের গাত্রদাহ তার মানসিক শান্তিতে কখনও আগুন ধরায় না। সে কারণে আমাদের এ বহু-আলোচিত অবৈধ প্রণয়টি কন্টক-বিলাসবিহীন, ভারি সাদামাটা। একদিন বজ্রকে প্রশ্ন করেছিলুম,

—আমি যে নিত্যি কবির সঙ্গে রাত অবধি আড্ডা মারি, তোমার হিংসে হয় না?

—কেন হবে? তুমি কি কবির প্রেমে পড়েছ?

—প্রেম কাকে বলে?

—বোধহয় ভালোবাসাকে।

—ভালোবাসা কাকে বলে?

—সব সময় হেঁয়ালি।

—দেখো, কবিকে ভালোবাসি কিনা জানি না, তবে এখনও তাকে ঘৃণা করি নি।

—এখনও কার নি মানেটা কী? পরে ঘৃণা করবে?

—হ্যাঁ। কবি যেদিন বলবে, মোহনা, আমি তোমায় ভালোবাসি। প্রেম ব্যাপারটা যে কী, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথার অবধি নেই, সেই কৈশোর-জীবন থেকেই। তখন বয়েস বোধহয় পনেরো। একপাল ছেলে-বন্ধুর সাথে বাড়ির লনে ক্রিকেট পিটে দিন বেশ হই-হই করে কেটে যাচ্ছে। সে সময় একবার টানা সাতদিন ধরে বৃষ্টি। খেলাধুলো বন্ধ। বৃষ্টি-ঝমঝমে সবুজ পৃথিবী দেখতে-দেখতে আমার সব সময় নেশা লেগে যায়। সেদিন হুহু ভিজে বাতাসে চুল উড়িয়ে, বৃষ্টির গুঁড়োয় শরীরমন মেলে বসে আছি বারান্দার রেলিঙে, হঠাৎ উদয়ন এসে পিঠে হাত রাখল, যা আগে কখনই করে নি। আমি কিছু বুঝবার আগেই আমার শরীরের আকাশ চিরে এপার ওপার বিদ্যুৎ শিউরে গেল। তার নাম কি প্রেম ছিল? আমি শরীরের থরথর সুখ চেপে প্রশ্ন করেছিলুম,

—আজ খেলা নেই, তবু এসেছিস কেন?

—তোকে দেখতে, মোহনা।

—কেন?

—ভালোবসি।

সেই পনেরো বছরেই ভারি চিন্তা জমাল, উদয়নকে আমি কি ভালোবাসি? বর্ষাবেলায় কই তার কথা তো আমার মনে পড়ে নি। তবে একটি আঙুলে সে আমার শরীরের সেতারে অমন ঝঙ্কার তুলল কেন? এখনও কেন রেশ ঝিমঝিম করে শিরায়-শিরায়? কাকে বলে ভালোবাসা? এই যে তারপর থেকে কেবলই মনে পড়ছে উদয়নের মুখ—এ স্মৃতি তো কালও ছিল না। ক্রিকেট খেলার চেয়েও অনেক সহজ ব্যাপার এই ভালোবাসা। শুধু একবার পিঠে হাত, একটুকরো কথা 'ভালোবাসি'। ব্যাস! এই! শুধু এমনি করে হীররঞ্ঝা, রোমিও-জুলিয়েট, লায়লা-মজনুরা প্রাণ দিয়ে দেয়? আশ্চর্য, বড়োই আশ্চর্য।

নাঃ, এর পরেও উদয়নের সাথে তথাকথিত

প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। কারণ উদয়ন যতবার নীল খামে কিংবা চোখের পরদায় প্রেমের ছবি বাড়িয়ে ধরেছে, ততবার আমার মনের সব সুখানুভূতিকে মাটি করে এক তর্কবীর উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছে—'তাহলে প্রেম মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?' অঞ্জন, শুভময় কিংবা বীরেশ, কোনো ঘোরলাগা বরষায় পিঠে হাত রাখলে ঠিক একই ভাবে হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোত হয়ে উঠত নাকি নায়েগ্রা প্রপাত? অথবা বৃষ্টির মদে আওয়াজ ভিজিয়ে কেউ যদি বলত, 'ভালোবাসি' তবে? ইচ্ছে কি হত না আমার, সব-কিছু উজাড় করে হয়ে যাই লায়লা, কিংবা আনার-কলি? তবে অঞ্জন নয়, শুভময় নয়, বীরেশও নয়; উদয়ন কেন? ভালোবাসা কি একটা অভ্যাসমাত্র নয়? উদয়ন, শুভময়, অঞ্জন কিংবা অন্য কোনো জন—যে কোনো সময় কারুর সাথে, শুরু করলেই তো হল। বেশি তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। বরং ভালোবাসা ব্যাপারটাকে ভালো করে বুঝে নিতে চাই। তা কি কেবল দুটো মানুষের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই জন্ম নেবে? কিন্তু আমার যে অনেক বিস্তৃত কিছু চাই। কিন্তু ঠিক কী আমার পথ বুঝে উঠতে পারি না, তবে খুব বড়ো একটা কিছুর জন্য আমার ভেতরটা ছটফট করে। তখন কলেজের বন্ধু-বান্ধবীরা অনেকেই প্রেমের কবিতা এবং গল্প লেখবার চেষ্টা করছে। আমি লিখে ফেললাম একখানা রম্যরচনা যার শিরোনাম 'সখি, ভালোবাসা কারে কয়।' লেখাটা আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হতে, যেন অপ্রত্যাশিত হইচই পড়ে গেল। আমি হঠাৎ করে বেশি রকম প্রকাশিত হয়ে পড়লুম। হঠাৎ করে প্রেমপত্রের সংখ্যার হারও বৃদ্ধি পেয়ে গেল দেখলুম। কিন্তু আমার তখন প্রেমে পড়ার অবসরই নেই। আমি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছি, জেনে গেছি লিখতে পারি। লোকে প্রশংসা করে। একটা যে বিস্তৃত আগ্রহ জীবন আর পৃথিবী সম্পর্কে আমার মধ্যে ছড়ছড় করে বেড়ে উঠছিল, এখন লেখার মধ্যে যেন সেই বন্যা আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেল। লেখার বাতিক অল্পস্বল্প অবশ্য আগেও ছিল, কিন্তু খুব স্পষ্ট-ভাবে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেললুম,—আমি সাহিত্যিক হব।

সেই থেকে লেখার সাধনায় মেতে গেলুম একেবারে। একই লেখা বারে-বারে ফিরে-ফিরে লিখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলুম ক্রমাগত। খুব ভালো লেখা হওয়া চাই, তবেই তো বিস্তৃত পৃথিবীর বিস্তার তুলে ধরা যাবে। আমার বান্ধবীরা যখন জুবিলি পার্কে সহপাঠীদের সাথে প্রেম করতে ব্যস্ত, আমি তখন ভাবছি ওসব নয়, অনেক বড়ো দায়িত্ব নিয়ে আমি জন্মেছি। আমাকে সে দায়ভার পালন করতেই হবে, নইলে রেহাই নেই। এরই মধ্যে হঠাৎ শুনলাম অভিভাবকেরা আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন।

দুই

বন্দরকে ঘিরে অতি ছোট্ট জনবসতি এই পারাদ্বীপ। এইখানে আমি বজ্রর ঘর করতে এলুম। সাহিত্য তো দুরস্থান, একখানা ফিল্মের ম্যাগাজিনও এখানে সহজ-লভ্য নয়। তবে বাড়িতে সকলেই মনে করেছে বজ্রর মতো স্বামী যখন পেয়েছি, তখন আর অন্য কিছুর দরকার থাকতেই পারে না। লোকে বলে আমার স্বামী-ভাগ্য দারুণ। আর আমি ভাবি, আমি ঠিক কেমন স্বামী চেয়েছিলুম। কেমন মানুষকে একজন আদর্শ স্বামী বলা যেতে পারে। কী-কী যেন পাঁচখানা গুণ স্বামীর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন দ্রৌপদী? তা সবই তো পেয়েছিলেন তিনি, তবু লাঞ্ছনার একশেষ। অতএব স্বামীর গুণবিচারে কাজ কী? বজ্র যেমনই হোক, সে আমার স্বামী। ব্যাস, এই শেষ কথা। এর চেয়ে বেশি ভেবে লাভ কী? আজ যদি বজ্রকে পছন্দ না হয়, তবে কি স্বামী বদল করা যাবে? এদেশে এখনও কতটুকুই বা স্বাধীনতা মেয়েদের? কলেজের বান্ধবী সালমা

বলেছিল, 'তবু তোমরা হিন্দু মেয়েরা অনেক স্বাধীন। আমাদের মুসলিম সমাজে মেয়েদের কী অবমাননা দেখো। মসজিদে গিয়ে উপাসনার অধিকার পর্যন্ত নেই আমাদের।'

শুনে মনে-মনে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেছিলাম। আহা, নারীর কত সম্মান হিন্দু সমাজে! তাই তো পুণ্য শাস্ত্রের বচন: 'নারী নরকের দ্বার'। মন্দিরের দোর খুলে দিয়ে স্বর্গের দোর বন্ধ রাখা হয়েছে। নারী তবে কি মন্দিরের দোর দিয়ে নরকে ঢুকবে? "রামকৃষ্ণ-কথামৃত"-তে দেখি—রামকৃষ্ণদেবের মতো মানুষও বারে-বারে বলেছেন কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করতে। অর্থাৎ টাকা-পয়সা-গোরু-বাছুরের সাথে নারীকে একই পাল্লায় দাঁড় করিয়েছে সমাজের সর্বকোটির পুরুষেরাই। রাজা এবং সন্ন্যাসীর চিন্তাধারায় সেখানে তফাত নেই কোনো। বজ্র বলে, 'মোটেই না, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসলে নারীর প্রতি অন্ধ আসক্তিকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আসক্তি ছাড়া নারী তো মহাশক্তি। স্বয়ং সারদা-মাই তার নজির।'

বজ্রর কথা মানছি একশ-একবার। কিন্তু তবু আমার নালিশ স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে: এই যদি মনে ছিল ঠাকুর, কামিনী না বলে কামনা বলেন নি কেন, বাপু? তাহলে উভয় পক্ষের দাঁড়িপাল্লাটি সমান থাকত। যত দোষ কেবল কামিনীর! কই, নারীকে তো কখনও একই রকম মুক্তিমন্ত্রে উদ্বোধিত করে বলা হয় নি পুরুষেরা নরকের দ্বার, তাদের ত্যাগ করো। নারীকে ছাড়লে পুরুষ যাবেন স্বর্গে আর পুরুষকে ছাড়লে নারী তোমার গায়ে শতবার থু। কারণ পতি পরম দেবতা।

পরিস্থিতি যখন এই, তখন আমার পক্ষে বজ্রর পত্নীরই শেষ কথা। আমি বজ্রর বউ—এই আমার একমাত্র পরিচয়। বিয়ে হয়ে যখন এলুম তখন নতুন পরিস্থিতিতে আমার নিজস্ব নামটাও লোপ হয়ে গেছে দেখলুম। পাড়ার মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে, 'বজ্রদার বউ এমন কিছু দেখতে হয় নি।' পিসি-শাশুড়ি বলেছিলেন, 'তা আমাদের বজ্রর বউ রাঁধে বেশ।' পাড়ার সীতেশকাকা তো কোনোদিন নামই জিজ্ঞেস করেন নি আমার। এ বাড়িতে যখনই এসেছেন, দরাজ গলায় হাঁক দিয়ে বলেছেন, 'কই গো বজ্রর বউ, বজ্র বুঝি এখনও ফেরে নি?' আর অফিসের পার্টিতে? সেখানে তো মিসেস বাসু ছাড়া অন্য কোনো পরিচয়ই থাকতে পারে না।

আমি বজ্রর বউ। অতএব সকালবেলা চোখ মেলে প্রথমেই মনে হয় বজ্রকে সময়মতো পছন্দমতো ব্রেক-ফাস্ট দিতে হবে। ডিমের একই প্রিপারেশন বজ্র রোজ পছন্দ করে না। দুধের গেলাসে বোর্নভিটা গুলতে-গুলতে ভাবি যে ড্রেসটা বজ্রর জন্য রেডি করে রেখেছি তার বোতামগুলো তো চেক করা হয় নি। বজ্র অফিসে রওনা হলে ভাবি গতকাল তেতো চচ্চড়ি রান্না হয়েছিল, আজ করলার অন্য প্রিপারেশন করব, স্টাফড করলা করলে বজ্র ভালো খাবে। মুরগির স্টু প্রায়ই করি, আজ নার্গিস-ই কাবাব করলে কেমন হয়। বেলা পড়ে এলেই গা ধুয়ে নিত্য নতুন শাড়ি, গয়না, সাজ-গোজ। তারপর ব্যালকনিতে ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা। যেন বজ্র এখনই এসে নিয়ে যাবে বেড়াতে। জানি বজ্রর অত সময় নেই, তবুও পড়ন্ত বেলার ব্যালকনিতে একটি অপেক্ষার ছবি হয়ে গেছি বছরের পর বছর। অনেক রাতে মেকাপের জমি ফেটে সারা মুখে ক্লান্তির শেকড়বাকড়, চোখের পল্লব ঘুমের আঠায় চটচটে, তবু, যেই কলিংবেল ডাক দিয়েছে অমনি পরম অনুগত কুকুরটির মতো লেজ নেড়ে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি প্রভুকে স্বাগতম জানাতে। বজ্রর জন্য রান্না, বজ্রর জন্য সাজ, বজ্রর জন্যই বাঁচা। এইরকম বাঁচার চাকায় কখন পিষে হারিয়ে গেছে সাহিত্যচর্চা। বজ্রর বউ হয়ে বাঁচবার অভ্যাসে মোহনা হয়তো মরেই যেত, যদি না হঠাৎ কবিতার রীল নিয়ে কবি পৌঁছে যেত পারাদ্বীপের এই ব্যালকনিতে। যদি না বলত, 'মোহনা, তোমার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা।'

আবার মহা উৎসাহে আমি কলম ধরলুম। কবি

দু-এক জায়গায় আমার কবিতা-প্রবন্ধ-গল্প ছাপিয়েও দিল। ভারি আশ্চর্য লাগল দেখে লেখাগুলোর মাথায় ছাপার অক্ষরে যে নাম লেখা আছে তা মিসেস বাসু নয়, শুধুই মোহনা। আমি কেবলমাত্র মিসেস বাসু নই, নই খালি বজ্রর বউ; আমি মোহনা, আমি মোহনা। হুড়হুড় করে আমার কলম চলতে লাগল। আঃ, এখন রোজ মনে হয় আমি মরে যাই নি, বেঁচে আছি। আমি লিখি, কবি শোনে। মাঝে-মাঝে সমালোচনা করে কঠোর ভাষায়, আবার কখনও বা বলে, 'লিখে যাও তুমি, তোমাকে আমি মানুষের কাছে তুলে ধরব। তোমার বই ছাপাব।' কোনোদিন বা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় হইহই করে ওঠে, 'কী দারুণ লিখেছ, মোহনা। তুমি জন্ম-লেখিকা। তুমি যদি না লেখ তোমার পক্ষে সেটাই বড়ো অন্যায়।'

সন্ধেগুলো এখন আর ভাঙাভাঙা পাখির মতো বারান্দায় পড়ে গুমরোয় না; তার জুটে গেছে কবিতার অপার আনন্দময় আকাশ।

তিন

'কী সুন্দর তোমার চোখ, মোহনা। তোমার নাম দিলাম সুনয়না।' বছরখানেক বন্ধুত্বের পর আমার মুখের দিকে একদিন অপলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে বসল কবি।

'জানলে, কাল সুনয়না নামে একটা কবিতা লিখেছি, তোমারই কথা ভেবে।

'সুনয়না জোড়াদীঘি ভরা তরল বাসনা
পল্লবের অন্ধকার বনানী-রেখায়
বেঁধে কেন রেখেছ তুমি···'

'কবি থামো।' যদিও আত্মপ্রশংসা শুনতে ভালোই লাগছিল, তবুও থামালাম; কারণ কোনো গোলমাল পাকিয়ে তুলতে আমার উৎসাহ নেই। বললাম,

'সুনয়না ভাসায় না অন্য কোনো অপেক্ষিত ঘর
উজানি চাঁদনিতেও মাতাল জোয়ারি কেউ
বাঁধ ভেঙে ছাপায় না পার।'

'সাধু সাধু। এমন টপ করে কবিতা বানাতে কাউকে দেখি নি। কিন্তু সুনয়না, ঘর তুমি ভাসাও না জানি, তবু ঘরছাড়া পথিককে দু দণ্ড আশ্রয় দিলে এমন কী-ই বা ক্ষতি?'

'থামকা সেনটিমেনটাল হোয়ো না, কবি। তাতে কখনও ভালো কবিতাও তৈরি হয় না, আর ভালো ঘরও গড়া যায় না। ঘর থাকতেও তোমার যে এমন ভ্যাগাবনড অবস্থা তার জন্য তুমিই দায়ী।'

বিবাহিত জীবনে কবি ভারি অসুখী। তার একদা প্রেম-বিবাহিত বধূ তার সাথে থাকতে নারাজ। সে অন্য শহরে চাকরি করে। ছুটিছাটায় পরস্পরের দেখা। তার বেশি তারা সহ্য করতে পারে না পরস্পরের সঙ্গ। কবির অভিযোগ—তার বউ তার কবিতা শুনতে নারাজ। আমার তো ধারণা—দিনরাত কবিতা শোনবার ভয়েতেই কবির বউ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চায়। অ-কবি বউকে দিনরাত কবিতা শুনিয়ে যে অত্যাচার করা যায় তা বোধ হয় শত মারধোরের মাধ্যমেও সম্ভব নয়। আমার তো মনে হয়—মাতাল স্বামীর চেয়ে কবি স্বামী বেশি অসহনীয়।

কবি প্রায়ই বলে, 'মোহনা, তোমাদের জোড় বড়ো ভালো। তুমি কবিতা লেখ, বজ্রর তাতে কত উৎসাহ। তোমার কবিতাগুলো প্রথমে নিশ্চয়ই বজ্রই শোনে সব? আমার তো এমন কপাল যে বউ মোটে কবিতাই শুনতে চায় না।'

আমি শুধু একটুখানি হাসি। বলি না যে বজ্রর উপর এমন অত্যাচার কখনও করে দেখি নি। বলি না, গণতকারেরা রাজযোটক মিল ঘটাতে পারে না, জোড় বাঁধবার জন্যও সাধনা করতে হয়। শুধু বলি, 'কবিতা শোনাও, কবি। দেখি নতুন কী লিখেছ।'

কবির কবিতায় গভীর বিষণ্ণতা আর নিঃসীম একাকিত্ব জোরদার হয়ে বাজে। প্রায়ই অনুভব করি আমার আর বজ্রর সাজানো ঘরকরনার ওম কবির ভিতরটাকে তাতিয়ে তুলছে। বুঝতে পারি একটা

সঙ্গিনীর অভাব থেকে-থেকেই যেন সামনের সমুদ্দুরটার আকার ধরে নিতে চায় ওর ভিতরে। এমনি এক সমুদ্দুর অভাববোধ নিয়ে কবি একদিন বলে বসল,

'মোহনা, একদিন আমার সাথে সিনেমায় চলো।'

'কবি, কবিতা শোনাও। সিনেমা বজ্রর সাথে দেখব।'

'তোমার মন কি কখনও দুর্বল হয় না, মোহনা? ক্বচিৎ এক-আধটা দিন?'

'দুর্বলতা মানে তো অভাববোধ, কবি। যেদিকে অভাববোধ নেই সেদিকে দুর্বল হই কোন্ পথে বলো?'

'মিথ্যে কথা। এতই যদি সুখী তুমি বজ্রকে নিয়ে তবে আমায় রোজ ডাক দাও কেন?'

'কবিতার জগতে তুমি আমার সমমর্মী। বজ্র কবিতা বোঝে না।'

'সমমর্মীর সঙ্গই তো লোকে কামনা করে। সমমর্মীই তো মনের মানুষ।'

'শুধু কবিতা ছাড়া আর কোনোখানে তুমি আমি মিলি নি। দোহাই তোমার, এই কথাটি মনে রেখো।'

কবি অভিমান করে অ-সময়ে উঠে চলে যায়। সমুদ্রের বাতাস অভুক্ত চায়ের পেয়ালায় বালি ফেলতে থাকে। আমি ভাবি, দাম্পত্য মানেটা কী? একটা সমঝোতামাত্র নয় কি? ভালোবাসারও বুনিয়াদ কি একটা অভ্যাসমাত্র নয়? বজ্রর সাথে দাম্পত্য এবং ভালোবাসার একটা লাইসেন্স সমাজ আমাকে বানিয়ে দিয়েছে। অতএব আমি সেই লাইসেন্স হাতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। আমি বজ্রর সঙ্গে শুই, বজ্রর সাথে বেড়াতে যাই, বজ্রকে ছাড়া থাকতে আমি পছন্দই করি না। বহু বছর ধরে এইভাবে বাঁচবার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আমার এবং সে অভ্যাসকে বদলাবার তাগিদ আমার মধ্যে নেই। সেদিন বজ্র হঠাৎ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিল, খালি ব্যালকনি দেখে বলল, 'কী ব্যাপার? আজ আসর বড়ো তাড়াতাড়ি ভেঙে গেছে?'

'ভালোই হয়েছে। তুমি এসে গেছ, চলো দুজনে সিনেমায় যাই।'

অনেকদিন হল। কবি আর আসে না। কবির কি অভিমান হয়েছে? অথবা হতাশা? কবি তো আসলে পুরুষমানুষ, তায় স্ত্রী-পারত্যক্ত। সুতরাং একটু-আধটু টলমল অবস্থা তার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমিই বা কী করি? কবির হাত ধরবার জন্য আমার মনে কোনো আগ্রহ নেই। কবি বলেছিল, 'মোহনা, তুমি ভীতু কনজারভেটিভ।'

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কবি জানে না, আমার আকাঙ্ক্ষাহীন মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে ওইসব একক প্রেম-প্রস্তাবে। আমার গা ঘিন-ঘিন করে। বজ্রও বোঝে না ব্যাপারটা ঠিকমত। 'যার সম্পর্কে তোমার গা ঘিন-ঘিন, তাকে না হলেও তো তোমার চলে না দেখি। এ কেমন দ্বন্দ্ব তোমার মধ্যে, মোহনা, বুঝতে পারি না।'

হায়, কোনো পুরুষমানুষই বুঝতে পারে না যে শুধু বিছানা আর রান্নাঘরের মধ্যেই একজন মেয়ে সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। শুধু পুরুষমানুষের আকাঙ্ক্ষা কিংবা প্রেমলাভই একটি নারীর জীবনের শেষ কথা নয়। প্রেম ছাড়া আরও কিছু চায় সে, চায় আত্ম-বিকাশের জন্য আকাশ। অতএব আবার আমিই টেলিফোনে ডাক দিই কবিকে।

'রাগ করেছ? কতদিন আস নি। কবিতা লিখেছি অনেক। শুনবে না?'

কবিও যেন ডাকের অপেক্ষাতেই দিন গুনছিল। বলল, 'তুমি ডাকলে না যেয়ে পারি? তবে আজ ব্রত এসেছে, সঙ্গে নেব।'

ব্রত বয়সে ছোটো হলেও কবিতাসূত্রে কবির বন্ধু এবং আমারও। ব্রত আমার লেখা শুনতে খুব ভালো-বাসে। বলে 'তোমার কলমটা একটা ম্যাজিক স্টিক।'

ওরা দুজনে চলে আসতে মনে হল যেন ঘরের আলোগুলোর ভোল্টেজ বেড়ে গেছে। আমি কবিতার খাতা বার করতে-করতে জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যাঁরে ব্রত,

তোকে যেন রোগা দেখছি একটু। ভালো আছিস তো? লেখা-টেখা কেমন চলছে?'

'একদম ভালো নয়। তুমি আর কবিদা বেশ আছ। পরিবেশ নাহলে একা-একা কি কবিতা চলে? অন্তত একজনও সমঝদার চাই মোহনাদি, অন্তত একটি সঙ্গী।'

'ঠিকই বলেছিস, ব্রত। অন্তত একজনও চাই। নইলে শিল্পী বাঁচতে পারে না।'

গিরিডিতে কাজ করে ব্রত। প্রাণ হাঁপিয়ে গেলে মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়ে চলে আসে কবির ফ্ল্যাটে। ছুটো একটা দিন বাঁচার রসদ নিয়ে ফিরে যায় জাঁতাকলে। আমার নতুন লেখাগুলো শুনে ব্রত একেবারে লাফাতে লাগল—'মোহনাদি, লিখে যাও। তোমাকে কেউ আর রুখতে পারবে না। এবার একটা বই বার করবার চেষ্টা করো।'

সেদিন বিছানায় শুয়ে অনেক রাত অবধি ঘুম আসতে চায় না। সত্যিই কি ভালো কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছি আমি? নাকি ওরা এমনিই অমন বলে। কবি ব্রত দুজনেই যখন বলছে তখন একটু নিশ্চয়ই এগুতে পেরেছি। কিন্তু বই ছাপাবার মতো হয়েছে কি? পাঠকেরা নেবে কি আমার লেখা? এই অজ পারাদ্বীপে বসে বই ছাপাবার ব্যবস্থাই বা করব কেমন করে? নানা দুশ্চিন্তায়, উত্তেজনায় এপাশ ওপাশ করি কেবল, ঘুম আসতে চায় না। বজ্রর ঘুম ভেঙে যায়। বলে,

'কী হল? ঘুম আসছে না কেন তোমার?'

'বই বার করব। সে বিষয়ে ভাবছি।'

'সে চিন্তাটা তো কাল সকালেও করা যেতে পারে। কী যে লেখার ভূত মাথায় চেপেছে তোমার। এজন্য ঘুম মাটি করার কোনো মানে হয়!'

চার

কবি বদলি হয়ে গেল গিরিডিতে। আমার ব্যালকনির সান্ধ্য ছবিতে আঁকা থাকে এখন একখানি ঈজিচেয়ার, একটিমাত্র চায়ের কাপ। সামনের ফ্ল্যাটের দরজা এখন আর সপাটে বন্ধ হয় না। বরং মহিলাটি কাপড় তুলবার ছুতোয়রেলিঙেহেলান দিয়েদাঁড়িয়ে থাকেন অনেকক্ষণ আর মাঝে-মাঝে তির্যক দৃষ্টিতে উপভোগ করেন আমার ক্লান্ত একাকিত্ব। তখন আমারই ইচ্ছা করে দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে যেতে। ব্রতর চিঠি এসেছে—'মোহনাদি, কবিদা এখানে আসায় আমার যে কত উপকার হয়েছে লিখে প্রকাশ করা যায় না। আমি যেন বেঁচে গেছি।' কবিরও চিঠি এসেছে—'মোহনা, তোমায় ছাড়া যদিও খারাপ লাগছে তবু একটাই সুখের কথা দিনগুলো কবিতার আকাশ থেকে ছিঁড়ে পড়ে নি। কারণ এখানে ব্রত আছে।'

শুধু আমারই দিনগুলো বড়ো বেশি দুর্বহ হয়ে গেছে। রান্নায় মন লাগে না আজকাল। বজ্রর জামা-কাপড় ঠিক থাকছে না প্রায়ই। অবস্থা দেখে বজ্র বলল, 'আজকাল তুমি এমন হয়েছ কেন, মোহনা?'

'আমার যে কিছুই ভালো লাগছে না। কবি চলে যেতে ভয়ানক নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি যেন।'

'তবে তো সত্যিই তুমি কবির প্রেমে পড়েছ মনে হচ্ছে।'

'তোমরা পুরুষমানুষেরা মেয়েদের জন্য কি অন্য কিছুই চিন্তা করতে পার না, বজ্র?' বজ্র লজ্জিত বোধ করে নিজের কথায়, কিন্তু ওর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অবসাদের কারণও ওর মাথায় ঢুকছে না। আমি বজ্রকে বলতে পারি না, শুধুমাত্র মিসেস বাসু হয়ে বেঁচে থাকতে আমি পারি না। ভয়ঙ্কর হাঁপিয়ে যাই। বিশ বছর বজ্রর বউ হয়ে কাটিয়ে দেবার পর এই সবে গোটা দুয়েক বছর হল আমি নিজেকে আ বিষ্কার করেছি। এখনই আবার মৃত্যুর পরোয়ানা। কিন্তু বিশ বছর আগে যা পেরেছি এখন আবার একবার তা পারি না। আমি আমার আকাশকে চিনে ফেলেছি, খাঁচায় আর কিছুতে ঢুকতে পারব না। কবি বলেছিল, 'মোহনা, স্বনামধন্য সাহিত্যিকা হবে তুমি, সন্দেহ

নেই।' কবির কাছে শুনে-শুনে যে স্বনামধন্য সাহিত্যিককে আমি আমার ভবিষ্যতের ঘরে ঐকে রেখেছিলাম তাকে বিসর্জন দেওয়া সহজ নয়। প্রতিদিন একটু-একটু করে কবি আমার উচ্চাশাকে বিস্তৃত করে দিচ্ছিল আমার অজান্তেই, সেই সাথে আত্মপ্রকাশের অপার আনন্দকে চিনিয়ে দিচ্ছিল ওর সঙ্গ। এখন বোকার মতো মাঝে-মাঝে বঞ্জকেই ধরে বসি :

'একটা কবিতা লিখেছি। শোনো না।'

'উঃ মোহনা, দোহাই, কবিতা শুনিও না। তোমাদের ও আধুনিক কবিতার মাথামুণ্ডু আমি একবর্ণ বুঝি না।' নিজের আচরণে কুঁকড়ে যাই আমি। কবির বউ পালানোর করুণ ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ক্যাম্পাসের কোনো-কোনো পরিচিতা মহিলাকে সাহিত্যের জগতে টানবার চেষ্টা করে দেখেছি তাতে বন্ধুর সংখ্যা কমে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো প্রাপ্তি ঘটে নি। অতএব একলাই ছটফট করি অন্তত একটি সঙ্গীর জন্য।

কবি যাবার সময় আমার একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে গেছে। বলেছে, 'মোহনা, তোমার কবিতার বই বার করব। আমি চাই লোকে জানুক তোমাকে।' আমি আশায় আছি কবি বই বের হবে। একবার বই বের হলে জানলা খুলে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর অবশ্যই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব বাধাহীন-ভাবে। কিন্তু মাসে পর মাস অপেক্ষার যন্ত্রণা আমাকে তিল-তিল করে মারতে থাকে, কবি নিরুত্তর। কবিতার সাথে-সাথে আমার সমস্ত সত্তা যেন অপ্রকাশের কারাগারে গুমরাচ্ছে। কী হয়েছে কবির? মাস দুয়েক হতে চলল চিঠি পর্যন্ত দেওয়া বন্ধ করেছে। এমন তো কথা ছিল না। অবশেষে ব্রতর শরণাপন্ন হই। ব্রত জানায়, 'মোহনাদি, কবিদার বউ প্রায় মাস দুয়েক হল অসুস্থ শরীরে চাকরি ছেড়ে কবিদার কাছে এসে বাস করছেন। তাঁর দারুণ ঈর্ষাবোধ, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার সাথে কবিদার অবৈধ প্রণয়ের অভিযোগে কবিদাকে প্রায় পাগল করে তুলেছেন। শুনলে তুমি খুবই দুঃখ পাবে, একদিন কবিদার অনুপস্থিতিতে তোমার কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করা হয়েছে। কবিদার পক্ষে তোমার সাথে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। পাণ্ডু-লিপির মৃত্যুসংবাদ কবিদা তোমাকে জানাবেন কোন্ মুখে বলো। লজ্জায় দুঃখে আমার কাছে একদিন কেঁদে ফেলেছিলেন কবিদা।'

হায় রে অবৈধতা। তোর চেহারাটা আসলে যে কী, তা তো আজও জানলুম না। শুধু সাজা পাওয়াই সার।

আমি কবিতার পর কবিতা লিখে চলেছি। মাঝে-মাঝে ছোটোগল্পও লিখছি। কিন্তু সেসব কেমন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাড়ির সামনে সারি-সারি নারকেলপাতা সমুদ্রের বাতাসে অবিরাম ঝালর দুলিয়ে কী যে সব আশ্চর্য অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে, আমার ভিতরে আমি কি তার এক অংশও প্রকাশ করে উঠতে পেরেছি আমার কবিতায়? ঝাউবনের নিঃশব্দ নরম হালকা ছায়ার মধ্যে দিয়ে চলে যাবার অনুভূতিকে যেন কোনো শব্দের সাজেতেই ঠিকমতো তুলে ধরা যাচ্ছে না। রাত্রিতে যখন এক আকাশ জোছনার টানে সমুদ্রটা মাতাল হয়ে উঠে তখন আমারও রক্তস্রোতে জোয়ারের উথাল-পাথাল যেন শিরা-উপশিরার বাঁধ ছিঁড়ে ফেলতে চায়। আমি পাগলের মতো ভাষার মড়াই হাতড়াতে থাকি এক মুঠো বীজের জন্য। বিস্ময়কর পৃথিবী, বিচিত্র মানুষজন আমার ভিতরে প্রকাশিত হবার জন্য ছটফট করছে। গর্ভযন্ত্রণার মতোই এ এক অসহনীয় যন্ত্রণা। আমার সমস্ত প্রাণবায়ু উৎকণ্ঠিত, অথচ আমি যেন যা চাই তা কিছুতেই করে উঠতে পারছি না। আমার এ কষ্ট আশেপাশে কেউই বুঝতে চায় না, এমনকী বঞ্জর মতো সমঝদার স্বামীও নয়। আর সেই জন্যই যন্ত্রণা যেন প্রতিদিন দ্বিগুণতর হয়ে উঠছে। আমি ক্রমে

ভীষণভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছি। অবশেষে একদিন লিখে ফেললাম ব্রতকে, 'কদিন ছুটি নিয়ে চলে আয় না ব্রত; আমাদের বাড়িতে। তীব্র জীবনবোধের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছি যেন। তুই একটু আশ্রয় দে আমাকে।' সব চিঠিই আমি বঞ্জকে পড়াই। অতএব এ চিঠিটা পড়ে এই প্রথম বঞ্জ আপত্তি জানাল—'তুমি অন্য কোনো পুরুষের কাছে মানসিক-ভাবেও আশ্রয় ভিক্ষা করছ, এ আমার পক্ষে অপমান-জনক।'

বুঝলুম ওই একান্তই অবৈধ আশ্রয়ভিক্ষা। চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। আমি বঞ্জর বৈধ স্ত্রী। তার অপমানে আমারই অপমান। তবে শিল্পীর এই অবৈধ সত্তা আমার মধ্যে কেন দিয়েছ, ভগবান? আমার ভিতরে কেন এ অবৈধ ভূকম্পন। এ ভূমিকম্পে আমি এবং আমার সাজানো সংসার যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। দয়া করো আমাকে, দয়া করো।'

'মোহনা, কাত হয়ে শোও। দুঃস্বপ্ন দেখছ।' বুঝতে পারলুম বিছানায় উপুড় হয়ে বিড়বিড় কর-ছিলুম, 'দয়া করো, দয়া করো।'

পাঁচ

ক্রমেই আমার ঘরকরনায় বিপর্যস্ততা বাড়তে থাকে। এই বিশৃঙ্খল গৃহস্থালির সাথে বঞ্জর পরিচয় ছিল না। সে কেবলই বিরক্ত হতে থাকে। কিন্তু আমিই বা কী করি। আমি যেন ক্রমেই আর আমাতে নেই। এখন আমার জীবনে লেখা ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই। খাতার পর খাতা ভরে উঠছে। যদিও জানি না সেসব কোনোদিন ছাপাখানার আলো দেখবে কিনা, তবুও আমার কলমের সাথে জড়িয়ে থাকে দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা —একদিন নিশ্চয়ই আমার লেখারা জনগোষ্ঠীর ঘরে-ঘরে সমাদৃত হবে। আমি এত করে মানুষের কথা লেখবার সাধনা করে গেলাম, তা কি কোনোদিন মানুষেরা নেবে না? যদিও এই ক্ষুদ্র পারাদ্বীপে কোনোরকম সুযোগই নেই, তবুও কোনো না কোনো উপায়ে সন্তানের মতো এই লেখারা অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পৃথিবীর আলো নিশ্চয়ই দেখবে।

ছয়

শ্বশুরমশাই হঠাৎ মারা যেতে নিঃসঙ্গ শাশুড়ি-মা দেশের বাড়ি ছেড়ে পারাদ্বীপের ফ্ল্যাটে চলে এলেন, এখন থেকে আমাদেরই কাছে থাকবেন।

এখানে সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি তাঁকে যে ব্যাপারটা অসন্তুষ্ট করল, তা আমার লেখবার নেশা। বউ মানুষ রাঁধবে বাড়বে, ঘর সাজাবে এবং অবসর সময়ে শাশুড়িকে সঙ্গ দেবে; তা নয়, কোনোরকমে ডালভাত নাবিয়ে বসে পড়ল কাগজ কলম নিয়ে।

'এমন অনাছিষ্টি বাপু বাপের জন্মে দেখি নি। বলি, এসব ছাইপাশ লিখে হবেটাই বা কী? তুমি কি ভাবছ রবিঠাকুর হবে?'

সেদিন সকালে কলম হাতে ভাবছি শরতের আকাশটা যে একটা আশ্চর্য রকমের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার স্বাদ গন্ধ খুবই আলাদা অন্য দিনের থেকে। শরতের রোদমাখা মনের আঙিনাটাকে কেমন করে পুরোপুরি তুলে ধরব খাতার পাতায়। এই এক যন্ত্রণা—কিছুতেই গোটাটার ছবি তুলতে পারি না। ডানার কিছু পালক খসবেই খসবে। শাশুড়ি এসে দাবি জানালেন,--এখন মোটেই বসা চলবে না লেখা নিয়ে। আজ বিকেলে জলখাবার কী দেবে বঞ্জকে? কিছুই তো যোগাড় কর নি দেখছি। তাছাড়া আমার জন্য একটু পোস্তচচ্চড়িও রাঁধো দেখি,। রান্না তো মুখে দেওয়া যায় না।'

প্রথম-প্রথম আপত্তির সুরটি মোটামুটি সহনীয় ছিল। কিন্তু ক্রমেই তা ভয়াল রূপ ধারণ করছে। কলম ধরলেই চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুমি গেরস্ত বউ। গেরস্ত-বিধিমত চলবে। কাজের সময় লেখা কিসের?'

গেরস্তবিধি কথাটা শুনে চমক খাই। তার মানে লেখাটা গেরস্ত বউয়ের পক্ষে বৈধ কাজ নয়। এতদিন তো কবির সঙ্গকেই অবৈধ শুনে এসেছি, এখন কলম-

সঙ্গও অবৈধ ঘোষিত হল। আমি খুবই কষ্ট পেলুম। আস্তে সরে এসে দেরাজ খুলে দাঁড়ালুম। সেখানে রাশি-রাশি লেখা জমে উঠছে—আমার অবৈধ সন্তানেরা। আমি হাত বুলাতে থাকি তাদের গায়ে। কী গভীর মমত্ব আমার ওদের প্রতি। অবৈধ সন্তানের জন্য মায়ার পরিমাণ কি বেশি হয়?

শাশুড়ি-নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করি সারাটি দিন; নইলে অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু রাত্রিটা একান্তই আমার নিজস্ব। মধ্যরাত অবধি কাটাই লেখা নিয়ে। রাত-জাগা নিয়ে বজ্র আপত্তি জানায়—'এভাবে রাত জাগলে শরীর ভেঙে যাবে যে।' রাতজাগার খবরে শাশুড়িও গজগজ করেন সারাটি দিন। কিন্তু আমি তাদের কারুর কথা শুনি না বা শুনতে পারি না। আমাকে যে লিখতেই হবে। অবশেষে সত্যিই এক-দিন অসুখ এসে পড়ল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'পরিশ্রম না কমালে নিরাময়ের কোনো আশা নেই।' দাঁতে দাঁত ঘষে শাশুড়ি বললেন, 'লেখার ভূত কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পারলে ওর ব্যামো সারবে না।'

সাত

ব্যামো ক্রমেই বাড়ছে। দীর্ঘ দিন পরে ব্রত এবং কবি দুজনের কাছ থেকেই চিঠি পেয়েছি। অনেক দিনের চেষ্টায় গিরিডিতে ওরা একটা সাহিত্যসভার আয়োজন করছে। সেখানে বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা আসবেন কলকাতা থেকে। ব্রত লিখেছে, 'মোহনাদি, যে করেই পার তিনটে দিনের জন্য সে সময় অবশ্য চলে আসবে। তোমার ভালো লেখা কিছু সঙ্গে এনো। এই আসরে তুমি লেখা পড়লে, আমার বিশ্বাস, তোমার রাস্তা খুলে যাবে। তাছাড়া, সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় হওয়াটাও তো দরকার।'

এ চিঠি পাওয়ার পর দ্বিগুণ উৎপাহে কলম চলতে লাগল। শারীরিক অসুস্থতাটা অতি তুচ্ছ মনে হল আমার। সাহিত্য আসরের জন্য খুব ভালো কিছু লেখা তৈরি করবার জন্য আমি উঠেপড়ে লেগে গেলাম।

আজ ক্লিনিকে গিয়েছিলাম। ফিরতে পথে শরীরটা বড্ড বেশি ক্লান্তি জানান দিতে লাগল। অনেকগুলো নতুন লেখায় হাত দিয়েছি, শেষ করে উঠতে পারব তো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে? অনেক বিরোধিতার পর রাজি করিয়েছি বজ্রকে সাহিত্য আসরে সস্ত্রীক উপস্থিত হবার জন্য। এখন নাকি বজ্রর ভীষণ কাজ। এখন নাকি আমার শরীর ভীষণ খারাপ। এখন নাকি যাওয়া সম্পর্কে শাশুড়ির ভীষণ আপত্তি। কিন্তু সব ভীষণ অসুবিধার চেয়ে আমার ভিতরের তাগিদ ভীষণতর। অতএব বজ্রকে ছুটি নিতে হয়েছে। এতদিন পরে অবশেষে সুযোগ এসেছে। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা। এর সাথে আপোস চলে না। আমি নিজের শরীরকে বোঝাচ্ছিলাম ফিরতি-ট্যাক্সিতে বসে। স্থির হও, সতেজ হও। শুয়ে পড়লে চলবে না, শেষে কি তীরে এসে তরী ডোবাবে? মনে রাখো—তোমাকে লিখতেই হবে।

গাড়ি থেকে নামতেই দেহটা শোবার ঘরের জন্য আঁকুপাঁকু। কিন্তু লবিতে পৌঁছেই থামতে হল। এ যেন থামা নয়, স্থাণু হয়ে পুঁতে যাওয়া মেঝের মধ্যে। আমার লেখাগুলো আগুনে পুড়ছে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী শাশুড়ি এই পথই উপযুক্ত মনে করেছেন। আমার জিভ একবারও চিৎকার করল না। দুচোখ একফোঁটা জল দিল না সে চিতায়। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। শুধুই দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। আচ্ছা, শতপুত্র হারিয়ে গান্ধারী যে শোক পেয়ে-ছিলেন, তার পরিমাণ কতটা? আমার শতাধিক সন্তান দাউ-দাউ করে জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। গান্ধারীর তবু সশ্রদ্ধ সমব্যথী ছিল কত। অথচ আমার কেউই নেই দুঃখকে ভাগ করে নিতে। আমার সন্তানেরা যে অবৈধ।

যামিনী রায় ও আমরা

দ্বিতীয় কিস্তি

প্রণতি দে

আমাদের অনেকদিন থাকতে হবে বলে যামিনীদা আমাদের জন্য বাঁকুড়ার সবথেকে ভালো চাল—রামশাল আর সীতাশাল—জোগাড় করলেন, বস্তায় বেঁধে তুলে রাখলেন। কয়লাও জোগাড় করেছিলেন, আর টিন-টিন কেরোসিন, মোমবাতি—কী যে না! আমার স্বামী সময় পেলেই সপ্তাহান্তে বাড়ুটিছাটাতে আসতেন, কিন্তু কলেজ থাকলে বেশিদিন থাকা হত না। রিপন কলেজের একটা অংশ তখন দিনাজপুরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু প্রিনসিপ্যাল শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ তখন কলকাতায় ছিলেন। তাই আমার স্বামীকেও তিনি কলকাতায় রেখেছিলেন—ওঁর বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন আমার স্বামী। বেলেতোড়ের গরমে আমার স্বামীরও কষ্ট হত। সেই সময় উনি অ্যানটি-ফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যানড আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রনাথের "রথের রশি" নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন—চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছিলেন লেখকশিল্পীরাই। সেজন্যে মধ্যে কয়েক সপ্তাহ আসতে পারেন নি। নাটকটি হয়ে গেলে, কলেজও গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হলে, চলে এলেন—মে মাস নাগাদ। তখন প্রচণ্ড গরম—আর যামিনী-দার থিয়োরি (সান্ত্বনা দেবার জন্যে কি?)—যুদ্ধের ফ্রনটের উত্তাপের জন্যেই আমাদের এবারের গরম, এড়াবে কী করে? আমার স্বামী কলকাতায় ফিরে যাবার আগেই ঠিক হল একদিন অন্নদাশঙ্কর রায়ের কাছে যাওয়া হবে। সে বছর, সত্যিই, বৈশাখে কালবৈশাখী এত কম হয়েছিল—কেন জানি না। খুব গরম, তবুও ঠিক হল—ভোরে গোরুর গাড়ি করে স্টেশনে যাওয়া হবে—ট্রেনও খুব ভোরেই। দিদি তো তিনদিন ধরে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ব্যবস্থা যে কত করলেন—যেন কত দূর দেশে যাওয়া হবে—আমরাও যে যা পারি গুছিয়ে নিয়ে স্টেশনে গেলুম। ট্রেন আসতে সেদিন লেট। যামিনীদা মানবেন না।

খুব শরীর খারাপ হতে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গেই তল্পিতল্পা বেঁধে আবার আমরা বাড়ি ফিরে গেলুম। অন্নদাবাবুরা বাঁকুড়ায় বসে কী যে ভাববেন—সেই কথা বোধ হয় আমার স্বামীই পাড়েন। ফলে পটলকেই পাঠানো হল—বাবার শরীর খারাপ হয়েছিল বলে আসা হয় নি।

উনি বেলেতোড়ে ফিরে আসার পর আরেক দিন ঠিক করা হল যাওয়া হবে। সেবার ভাগ্যিস কিছু হয় নি—আমরা অন্নদাবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়িতে লীলাদির অপূর্ব ব্যবস্থাপনায় সারাদিন কাটিয়ে এলুম। ওঁদের এবং আমাদের বাচ্চারা প্রকাণ্ড বাগানে মহাখুশিতে কাটাল। এই সময় যামিনীদার দাদা শ্রদ্ধেয় বসন্তরঞ্জন রায়—যাঁর বাড়ির একাংশে আমরা ছিলুম—তিনিও এসে পড়েছেন। ইরা তো ওঁর সঙ্গে প্রায় সারা দুপুর কাটাত—তখনকার ফল রেকাবি করে নিয়ে যেত—জামরুল, কালোজাম, ফুটি, পরে বেলের পানা ইত্যাদি (অনেক কিছু ওঁরই বাগানের) ওঁর ঘরে—দেড়তলা-দোতলায় দক্ষিণদিকে। আর কী যে করত—নিশ্চয়ই অনেক গল্প শুনত, আর নিজে বকর-বকর করত।

বৃষ্টির লেশমাত্র আভাস নেই। রোজ তাই আমি বিকেলে নৈঋত কোণের আকাশে গিয়ে আশাভরে তাকাতুম—একটুকরো মেঘের প্রতিবিম্বও যদি দেখা যায়। যামিনীদাও জানতেন আমার এ অভ্যাস, তাই হেসে জিজ্ঞাসা করতেন—কী বউমা, কিছু কি আভাস বা সংকেত পেলে? আমার স্বামী আসার পর উনিও মেতে গেলেন এই কাজে—আমারই ভালো হল সঙ্গী পেয়ে। কোনোই আশা নেই—দিনের পর দিন সে কী উৎকণ্ঠা, কী দুরাশাই বলতে হয়। যেন আমরা অন্যায় কিছু চাইছি। এরকম হতে-হতে হঠাৎ একদিন কী প্রচণ্ড ঝড় উঠল—অভাবনীয়। দরজা জানালা দুম-দাম করে পড়তে লাগল। এইবার আসল বৈশাখীর কালো মেঘ করে প্রচণ্ড ধুলো উড়িয়ে এল—আমার গায়ের জোরে সে দরজা জানালা বন্ধ করতে পারি না। ইরা তো সঙ্গে-সঙ্গেই 'হাওয়া'; তারা আর আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে বন্ধ করলুম। ওঁকে ডেকে-ডেকে সারা হলুম—কিন্তু উনি কোথায়? এ-ঘর ও-ঘর, বাড়ির বাইরে চারদিক খুঁজে কোথাও পেলুম না—এই ঝড়ে কোথায় গেলেন? যামিনীদার বাড়ি? বৃষ্টি নামল অঝোরে। কোথায় গেলেন—কী জানি! তারা আর আমি দালানের দরজায় দাঁড়িয়ে ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব দেখছিলুম, একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবেই।

সে কী বৃষ্টি—মুষলধারে বললে কিছুই বলা হয় না। এতদিনের গরমের গ্লানি নিংড়ে ধুয়ে জল এল—সে যে কী সুন্দর—আরাম। দরজায় দাঁড়িয়ে একটু ভিজে, তারা আর আমি দেখছিলুম কতক্ষণ খেয়াল নেই—হঠাৎ একদম ভিজে-বেড়ালের মতো মাথা থেকে পা পর্যন্ত জুবজুব হয়ে ভিজে হাসতে-হাসতে উনি আসছেন। কে বলবে কলকাতার সেই ফিটফাট, কেতাদুরস্ত, দারুণ পরিষ্কার কাঁচি-ধুতি, দারুন ইস্ত্রি-করা পানজাবি পরনে বিষ্ণু দে। নিজের মূর্তি নিশ্চয় বুঝেছেন—হাসতে-হাসতে বাড়িতে ঢুকলেন। তারা তো ছুটে গিয়ে কোলে চাপল জোর করে। আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বললুম—ঠাণ্ডা লাগবে না? এ কী ছেলেমানুষি করেছ? উনি হেসে বললেন—কিচ্ছু হবে না। বাব্বা! কী আরাম এই জলে ভিজে। অনেক দিনের গরমের গ্লানি ধুয়ে এলুম।

একটু পরে দেখি—লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে যামিনীদা—কী বউমা, কেমন হল? বড়ো নির্মল আনন্দ হয়েছিল সেই বিকালটায়। তারপর থেকে মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হত, বাকি দিনগুলি আর বেশি কষ্ট হয় নি। ওঁর তো এমনিতেই শরীর খারাপ—রিউম্যাটিক হার্ট—একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে গলা খারাপ হত, জ্বর আর পেটখারাপ নিত্য লেগে থাকত, কিন্তু বেলেতোড়ে ভালোই ছিলেন—পরীক্ষার খাতা দেখা সত্ত্বেও। আমি নিজে সেবার একটু অসুস্থ অবস্থাতেই গিয়েছিলুম, কিন্তু বেলেতোড়ে এত হাঁটতুম, যামিনীদার

এবং পরে ওঁর সঙ্গে—যে আমার স্বামীর ভগ্নীপতি—ডা. সুবোধ মিত্র—ফিরে যাবার পর আমাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছিলেন। তারপরও, যে পরিমাণ পরিশ্রম করতে পেরেছি (স্কুলের জন্য)—এখনও ভাবলে অবাক লাগে নিজেরই।

ফেবরুয়ারি মাস থেকে কলকাতার স্কুলগুলি বন্ধ ছিল, মাত্র ছটি সরকারি এবং সেনট্রাল স্কুল বলে চালানো হচ্ছিল। শুনেছিলুম সে স্কুলগুলি ভালো চলছিল না। কিন্তু কেন জানি না—তখন আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি মহাশয় ছিলেন ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। তিনি আমায় লিখে জানালেন আমার কলকাতা ফেরা প্রয়োজন, কারণ চেষ্টা করলে হয়তো স্কুল খোলার অনুমতি পাওয়া যাবে। সেজন্য, আমাকে বেলেতোড়ের পাট গুটিয়ে ফেলতে হল—তড়িঘড়িই বলতে হবে। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল সবারই—আমার বিশেষ করে—কলকাতায় কী রকম খাবার পাব তা তো জানি ভেবেই। কিন্তু আশা দুর্মর—হয়তো আবার ফিরতে হবে—এই আশা নিয়ে সবকিছু গুছিয়ে রেখে ঠিক দু মাস পরে ১৪ই জুন আবার কলকাতায় ফিরে এলুম।

যামিনীদারও খুব কষ্ট হয়েছিল। আমাদের ফেরবার পর তিনি একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন:

শ্রীশ্রীহরি

বেলিয়াতোড়
২৩।৬।৪২

প্রিয়বরেষু,

গতকাল পৌঁছান সংবাদ পেয়েছি। তার পূর্বেই পত্র দিতাম। আপনারা যাবার পর থেকে শরীর মন দুই-ই খারাপ ছিল, তাই পত্র দিতে পারি নাই—চালগুলি যে উপায়েই হোক পাঠাব তবে দু দিন দেরী হবে, অন্যান্য জিনিসগুলিই আমার ছবি রাখার মত সবই ঠিক গুছিয়ে রেখেছি মায় হাঁড়ি-কুঁড়ি বিড়ে। এবং বরাবরই ঠিক থাকবে—আবার আসবেন এই আশায়। তবে দু মাসে এই পাড়াগাঁয়ের কষ্ট ভুগেও শহরের সমান, বরং বেশী খরচ হলো, আমার খুবই খারাপ লেগেছে। আমি তো কিছুই করতে পারি নাই, শুধুমাত্র এইটুকু কামনা করেছি, কোনরকমে চোখ বুজে দিন কাটুক আর আপনাদের শরীর একটু ভালো হোক, এ ছাড়া আপনাদের সম্বন্ধে আমার কিছুই করা হয় নাই। আর এই দু মাস এমনভাবে দুটি সংসার সুখে-দুঃখে চলেছিল, যাতে কারু কোন রকমে অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই—এইটা আমি পরম লাভ মনে করি। আমি একটু-একটু কাজ করছি, পটল পূর্বের মত কাজ আরম্ভ কোরেছে। দিন পনর এইভাবে চললে আপনাদের আনন্দ দিতে পারব। সেখানে যেয়ে বৌমায়ের শরীর কেমন আছে? আপনার শরীর কেমন জানাবেন। ইরা তারা কেমন? যাবার সময়ে তারুর শরীর খারাপ ছিল। এখানের আবহাওয়া সেই রকমই, জল হয় নাই তবে ঠাণ্ডা আছে। খোকন বেশ ভুগছে পোড়া নারেঙ্গায়, দুর্বলও খুব। মণির ফোড়া, সবচেয়ে মণি ইরা তারার জন্য দুঃখিত। সে এখানে থাকতে চায় না, যাবার জন্য ঝোঁক ধরেছে। কেশবের সম্বন্ধে, আমি মোটেই নিশ্চিন্ত থাকিব না, মাহিন্দ্রসাহেব দিল্লীতে। তাঁর স্ত্রীর ছবি আরম্ভ করলাম। তিনি ফিরতে প্রায় ২০।২৫ দিন দেরী। ইতিমধ্যে ছবি করে নিয়ে আমাকে একবার যেতেই হবে। জামাই-এর (তাতু) জন্য ও কেশবের জন্য অশোক মিত্রের দ্বারা হওয়া অসম্ভব মনে হয়, মৃণাল ১ দিনের জন্য এসেছিল তাকে উপদেশ দিয়েছি প্রাইস্ কনট্রোলারের নূতন আপিস হচ্ছে লোক নেবে। তৎপূর্বে আমাকে জানাতে যদি তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, ২।৪ দিনের জন্যও যাব। আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন। সেখানকার বন্ধুদের আমার প্রীতি নমস্কার জানাবেন। ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
আপনার যামিনীদাদা

শারীরিক তো বটেই, মানসিক দিক দিয়েও

উপকৃত আমি যে পরিমাণ হয়েছিলাম, সে আমিই জানি, সবথেকে উপকার আমারই হল। এরপর থেকে আমি ওঁদের বাড়ির একজন হয়ে গেলুম, সেইভাবে স্নেহ-ভালোবাসা-সম্মানও আমি যামিনীদা আর দিদির কাছে পেয়েছি। ছোটোদের কাছে, যেমন পটলের কাছে, আমি যে শ্রদ্ধা-শুভেচ্ছা-ভালোবাসা আন্তরিকভাবে পেয়েছি, তা আমিই জানি। সেসব কথা স্মরণ করলে মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। কিন্তু আরো বেশি দুর্লভভাবে উপকৃত হয়েছি আমরা দুজনেই। আমার স্বামীর পক্ষে এই প্রথম গ্রামে থাকা, গ্রামের জীবনের সঙ্গে একান্তে মিলিয়ে, অন্তরঙ্গভাবে থাকা যেটা, আমি জানি, উনি অনেক-দিন চেয়েছিলেন। পাঁতিহালে ওঁদের দেশ—সেখানে আমরা বহুবার গিয়েছি, কিন্তু একটি দিন বা বিকেল থেকে সারারাত, জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যায় কাটিয়ে ভোরবেলায় ফিরেছি—বাঙলা গ্রামে একটানা থাকা হয় নি। রিখিয়াতে তারপর অনেক বার গিয়েছি, খুব ভালোবাসতেন, ভালো লাগতও ঠিক, কিন্তু একটু তফাত আছে—সাঁওতাল পরগনার গ্রাম আর বাঙলার গ্রাম। রিখিয়াতে যাওয়া ঠিক করার ব্যাপারে আমার ধারণা ওঁর শৈশবের স্মৃতি জড়িত। ছোটোবেলায় মা-বাবার সঙ্গে শ্রীশ্রীবালানন্দস্বামী ব্রহ্মচারী মহা-রাজের আশ্রমে যাওয়া প্রতি পুজোর ছুটিতে—মা-বাবা ছিলেন ওঁর শিষ্য-শিষ্যা—এই ছেলেবেলার স্মৃতি গভীরভাবে মনে গেঁথে ছিল। রিখিয়া না হয়ে যদি বেলেতোড়ে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হত—আমি খুশিই হতুম।

আমার স্বামী পটলের কাজ দেখে তার বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, কিন্তু আমার পটলের সঙ্গে সম্পর্কটা আলাদাভাবেই গড়ে উঠল, সেই বেলেতোড়ের ভয়াবহ ঘটনাগুলির বিবৃতির সঙ্গে জড়িত হয়েই বোধ হয়। আমরা চলে আসবার পরও পটল প্রায়ই বেলেতোড় থেকে আমাদের জন্যে ওখানকার তাঁতে-বোনা পরদা, বেডকভার, গামছা ইত্যাদি নিয়ে আসত এত সুন্দর অথচ সুবিধার দরে এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। যামিনীদার একটা চিঠিতে (৩০/১০/২৪-এর) হিসাব দেওয়া আছে 'গামছা বড় ২ জোড়া—দু'টাকা বার আনা, বেডকভার ১টা—তিন টাকা এক আনা, বেডকাভার ছোট—দু'টাকা দু'আনা, মোট সাত টাকা পনের আনা।' আর বেলেতোড়ের মিষ্টি "মেচা"—বলাই বাহুল্য যখনই কেউ এসেছেন, যামিনীদা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বেলেতোড় থেকেই পটল যেন বড়ো হয়ে গেল, যামিনীদার সঙ্গে কাজ করা ছাড়াও, যামিনীদা নিজে এবং ছবির দায়িত্ব তো পটলের হয়ে গেল। রঙ তৈরি করা, ছবি আঁকার বোর্ড ঠিক করা শেষ পর্যন্ত বাঁধাই-য়ের কাজ পটলেরই হল, ছুতোর মিস্ত্রি না পাওয়া গেলে। পরে তো দেখেছি, কাঠের বাক্সতে ছবি নিয়ে, প্রয়োজনে দিল্লি, বোম্বাই ওকেই করতে হয়েছে। তাও মজার কথা—হয়তো ট্রেন কখন আসবে ঠিক নেই—পটল ছবির বাক্স নিয়ে হাওড়া স্টেশনে বসে আছে—'কখনও-কখনও তো একটা ট্রেন যাবে, আগেই গিয়ে বসে থাকো'—যামিনীদার আদেশ। যামিনীদার অসুখের সময় তো বটেই, আমার স্বামীর অসুখের সময়েও, নিজের কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও, প্রতি সপ্তাহে পটল ওঁর খবর নিজে এসে নিয়ে গেছে, শত কাজ থাকলেও—আমার স্বামীর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও এরকম যত্ন করেন নি। একদিন তো আমাকে বলল—ওর নিজেরই কঠিন রোগের দরুন ট্রাম থেকে পড়ে যাচ্ছিল, অন্য যাত্রী ওঁকে সাহায্য করে তুলে ধরেছেন—তবু এসেছে। সেবার আমি একান্তভাবে বারণ করেছিলুম—তবুও আমার মনে পড়ে, তারপরও আসতে ছাড়ে নি।

যামিনীদা মারা গেলেন ২৩শে এপ্রিল ১৯৭২-এ। আমরা রিখিয়া যাই ১৯৭৩-এ পুজোর পর। ১৯৭৭-এ একদিন সকালে ওঁর সঙ্গে হেঁটে ফিরে এসে দেখি, পটল আমাদের বাইরের ঘরে বসে রয়েছে। এক্ষেত্রে তো বলা যায় না, যামিনীদা খবর নিতে পাঠিয়েছেন।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করাতে বলল—'কেমন হল আপনাদের বাড়িটা, তাই দেখতে এলুম।' আমরা কী বলব জানি না—আমি পটলের আমাদের প্রতি দরদ দেখে অভিভূত হয়েছিলুম। তখনই ওঁর অসুখটার বেশ বাড়াবাড়ি। এখন আমার মনে সন্দেহ হয়—ও কি দেখতে এসেছিল রিখিয়া বেলেতোড়ের থেকে কত সুন্দর? কিছু বলে নি আমাদের, কিন্তু এই প্রশ্ন কি ওর মনে জেগেছিল—কী সৌন্দর্য দেখে ওর কাকাবাবু বেলেতোড় ছেড়ে রিখিয়া পছন্দ করলেন বেশি। জানি না কেন—আমার মনেও সে প্রশ্ন জেগেছে। অবশ্যি রিখিয়ার ছুটি পাহাড়—ত্রিকূট পুবে—দিঘারিয়া পশ্চিমে দারুণ সুন্দর—ভোলা যায় না।

কলকাতায় ফিরে প্রচুর পরিশ্রম করে স্কুল খোলার অনুমতি পাওয়া গেল—তাও অনেক শর্তে। প্রথমত, এক মাসের মধ্যেই একশ জন ছাত্রী জোগাড় করে রাখতে হবে বছরের বাকি ক-মাস। আমার সহকর্মীদের দারুণ চেষ্টায় আর ছাত্রীদের উৎসাহে দশ দিনের মধ্যেই পাড়ার পুরোনো ছাত্রীরা খবর পেয়েই এসে পড়ল—একশ জনেরও বেশি, সেখানে সেনট্রাল স্কুলে ষাট জনও রাখতে পারে নি। আমাদের স্কুলটি নেহাতই পাড়ার স্কুল ছিল, ছাত্রী-শিক্ষয়িত্রী সম্পর্কও দারুণ ছিল। আর, সেই ফেবরুয়ারি থেকে ছুটি, ভালো কি লাগে কারুরই? অভিভাবকরাও নিশ্চিন্ত হলেন—আমরাও আনন্দে জোর-কদমে স্কুল চালালুম, অনেক বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও বন্ধ হতে দিই নি। বাড়িতে প্রাইভেট ক্লাস করে, টিউটোরিয়াল গ্রুপ করে চালিয়েছি। স্কুল আর ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার কোর্স তো শেষ করতে হবেই জেনে।

ঠিক এই সময়েই অনেক বিদেশী সৈন্য কলকাতায় আসে। আমার স্বামীর বন্ধু স্নেহাংশুবাবুর উপর দায়িত্ব পড়ে—জন আরউইন আর তার বন্ধু হ্যারল্ড অ্যাকটনের। "কাফে ভিয়েনা" নামে তখন একটা ভালো রেস্তরাঁ হয়েছিল এসপ্ল্যানেডে—সেখানে আমার স্বামীর সঙ্গে ওঁদের আলাপ হবার কথা। কিন্তু কী হল জানি না—ওঁরাই এলেন আমাদের বাড়িতে, যদিও উনি অনেক আগেই ওখানে চলে গেছেন। ওঁরা আমাকে বললেন—যামিনীদার বাগবাজারের বাড়িতে তাঁদের নিয়ে যেতে। তাই করলুম। ভাগ্যিস, ঠিক সেই সময়ে পটলও এসেছিল বেলেতোড় থেকে। কাজেই ছবি দেখার কোনো অসুবিধা হয় নি। এই শুরু হল আমার স্বামীর সঙ্গে জন আরউইনের বন্ধুত্বের সুন্দর অধ্যায়। জন তখন গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন—ওঁকে থাকতে হত গভর্নমেন্ট হাউসে। কিন্তু প্রতি শনি এবং রবিবার বিকেলে জন অনুমতি জোগাড় করে-ছিলেন কালীঘাটে চলে আসার—আমাদের বাড়িতে। আমার স্বামীও শনি-রবিবার জনের জন্য অপেক্ষা করতেন, আর ভারতবর্ষের ইতিহাস আর আর্ট সম্বন্ধে জনকে সুন্দর করে বলতেন—আমিও সময় পেলেই বসে শুনতুম। এইভাবে উনি জনকে সব-কিছু ইনডিয়ান-এর উৎসাহী করে তুললেন—যামিনীদার ছবির একান্ত ভক্ত করে তুললেন। বেলেতোড়ে যাবার ইচ্ছা—লাটভবন থেকে তারও অনুমতি মিলে গেল। বেলেতোড় থেকে যামিনীদার মনে হয় তো বিদেশী লোক, তাও আবার মিলিটারি পোশাক পরে থাকবেন—গ্রামের লোকেরা কী ভাবে এই ব্যবস্থাটি নেবেন সে বিষয়ে বোধ হয় মনে প্রশ্ন আর দ্বিধা জেগেছিল—সেজন্য ওঁকে কয়েকটা চিঠিও লেখেন।

যামিনীদার ইচ্ছা ছিল যে আমরাই আবার পুজোর ছুটিতে বেলেতোড়ে যাই। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না, কারণ মা (আমার শাশুড়ি) ছিলেন পুরুলিয়ায়। তাঁর ইচ্ছা যে আমরা সকলে তাঁর কাছে যাই। সেজন্য পুজোর ছুটির আগে কোনো একটা ছোটো ছুটিতে উনি জনকে নিয়ে বেলেতোড়ে যান। যামিনীদার কয়েকটি চিঠি :—

বেলিয়াতোড়
২২।৭।৪২

* * * আপনার বন্ধু মিঃ আরুইন কি এখন কলকাতায় থাকবেন, তাঁর পুরা পরিচয় অনুগ্রহ করে জানাবেন * * *

বেলিয়াতোড়
১৮।৯।৪২

কাপ্তেন আরুইন যদি এসে পড়েন তা হলে যা ব্যবস্থা হতে পারে আর আমার সুবিধা-অসুবিধা সবই জানালাম। এতে আপনার তাঁকে আনা বা না আনার বিষয়ে বিবেচনা করতে বোধ হয় অসুবিধা হবে না। তবে সকলের উপর এই সময়ে আপনি সেখানে নানা অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন, এই সময়ে কোথাও যাওয়া আসার বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা কোরে করবেন……

বেলিয়াতোড়
২২।৯।৪২

…আপনারা এখানে থাকাকালীন, সামাজিক প্রথামত আমি কিছুই করি নাই। তবু আমাদের মনে কোন বিশ্রী দাগ নাই। আপনারা এ সময়ে এলে সেখানের নানা অসুবিধা হতে পারে, তবে পুজার সময় আসবার জন্যে আমি জানাতামই। এখনও তেলের টিন চাল সবই মজুত রেখেছি শুধু কয়লাগুলি খরচ হচ্ছে। অবশ্য আপনাদের আসা ও থাকার যে খরচ তার তুলনায় এগুলোর দাম কিছুই না। তবু খরচ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কেন তা জানি না।। আপনাদের এখানে আসার কোন হাঙ্গামা আমার নাই, কারণ এখানে আমরা সমদুঃখি—আপনিও বিদেশী আমিও তাই। বরং বউমা থাকাকালীন আমি বেশি সাহায্য পেয়েছি।

মি. আরুইন যদি আসেন, (সৈন্যবেশী হলেও এখানে কোন অসুবিধার কারণ নাই) থাকবার জন্য ডাকবাংলো। কিম্বা বসন্তদাদার বাড়ী খালিই আছে, থাকার জন্য একরূপ ব্যবস্থা হতে পারে। আর খাওয়ার ব্যবস্থা বাড়ীতেই রান্না করে, আপনার সঙ্গে কাঁটাচামচ আনা চাই, কারণ আমি জানি, এগুলি না থাকায় ওঁদের একরকম উপবাসেই কাটাতে হয়। আর যদি আপনি মনে করেন এখন থাক, তা হোলে সৈন্যবেশী ইংরাজের যাতায়াতের অসুবিধা জানিয়ে বন্ধ করা। সবটাই আপনার বিবেচনার উপর নির্ভর। আপনাদের জন্য আমার কোন সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন নাই, আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই আপনার সুবিধামত ব্যবস্থা করবেন, আমি বিনা প্রশ্নে তাই মেনে নেব। কারণ আমার মনে-মনে এই বিশ্বাস আছে। যা করেন আমার মঙ্গলের জন্য……জনকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে অনেক চিন্তা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন নিশ্চয়। কারণ: রমেনবাবুর চিঠি আজ পেলাম। মি. আরুইনের তিনি খুব প্রশংসা করেছেন চিঠিতে, তিনি অর্থাৎ আরুইন আমার এখানে আসবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, আপনাদের সঙ্গে আসতে পারেন যদি ছুটি পান।'

এই সময়ে পটলের সঙ্গেই বোধ হয়, যামিনীদা একটি 'মাটির বড়ো মুখ (দুর্গাপ্রতিমার) তৈরী হয়ে আছে'—পাঠিয়েছিলেন। বেলেতোড়ে দুর্গামূর্তি হাতে গড়া হত, ছাঁচে নয়। আর আমাদের বাড়িতে যেটা পাঠিয়েছিলেন সেটি নবম মূর্তি—দশমটি পূজার পর নিয়মানুযায়ী বিসর্জন দেওয়া হয়। মূর্তিটি দারুণ সুন্দর—আমাদের বন্ধু মিনি (মৃণালিনী এমারসন, আর. সি. বনাজির বড়ো কন্যা) ওটা দেখে বলেছিল, **Bishnu, it looks like you.** যামিনীদা সাহেদ সুরাবর্দিকেও আর-একটি পাঠিয়েছিলেন। আমাদের মূর্তিটি এখনও আছে—অপরূপ।

জনকে নিয়ে উনি দিন কয়েকের জন্য গিয়েছিলেন—ধর্মদাসের গাজনের সময়ে—ঠিক হয় নি—যামিনীদা চেয়েছিলেন সেই সময়ে যাওয়া হোক, সেটি বেলেতোড়ের বড়ো পরব। কিন্তু ছুটি মেলে নি। জন আর আমার স্বামীর জন্য এবারও আমরা যে বাড়িতে থাকতুম সেখানেই শোবার ব্যবস্থা

হয়েছিল। যামিনীদার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া আর সারাদিন থাকা। আমার স্বামী ওঁর পায়জামা, ধুতি, পাঞ্জাবি বেশি করে নিয়ে গিয়েছিলেন—ফরসা রঙের জন বাঙালি বেশেই থাকতেন। মন্দির প্রাঙ্গন সবই ঘুরে-ঘুরে দেখানো হয়েছিল। এমনকী বিষাক্ত সাপের খেলা পর্যন্ত। যামিনীদার অবশ্য এতে আপত্তি ছিল—অন্য ঘরে শুয়ে, নার্ভাস হয়ে বারবার ওঁদের ডেকে পাঠাচ্ছিলেন, শুনেছি আমার স্বামীর কাছে—'আর নয় বিষ্ণুবাবু, ওদের ছেড়ে দিন।' কিন্তু তখন জনের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মহা উৎসাহ—সবরকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা চাই। মিলিটারি পোশাক তো বাতিল, বরং গ্রামের লোকের মধ্যে জন মিশে যেতে পেরেছিলেন।

সে বছর প্রচণ্ড গরম পড়েছিল, আমরা ছিলুম বেলেতোড়ে। তারপর বর্ষাও ভালো হয় বেশ। নদী, নালা, পুকুর সব ভালোভাবে ভরে গিয়েছিল। চাষও ভালো হয়েছিল। প্রচণ্ড উত্তাপের পর সকলের খুব আরামও হয়েছিল, সবাই নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু এই অধিক বর্ষায় যে একটি প্রচণ্ড ভয় আর ক্ষতির কথা হতে পারে সেটা কারুর মনে আসে নি—ম্যালেরিয়ার মশা। প্রথম কার হয় জানি না, বোধহয় পটলেরই, তারপর দিদির এবং যামিনীদার নিজের, মণির—কেউ বোধহয় আর বাদ যান নি। শরীর খুব ভেঙে গেল, যদিও ডাক্তারদাদার চেষ্টায় সকলেই সেরে উঠলেন, কিন্তু মনের বল এবং উৎসাহ—সমস্তই কমে গেল যেন। আমরা চলে আসবার পর থেকেই মণি সঙ্গী হারিয়ে ছটফট করছিল, সুনীতিকেও চলে আসতে হল শ্বশুরবাড়িতে—যামিনীদাও দ্বিধান্বিত হয়েছিলেন থাকার বিষয়ে। আমাদের যে দুর্গামূর্তিটি পাঠিয়েছিলেন, অনবরত খবর পাঠাতে লাগলেন যে কালীঘাটে পুজা দিয়ে ওটা যেন বিসর্জন দেওয়া হয়—ওটা উনি আমাদের পাঠিয়েছেন বলেই এই অসুখ, এই অমঙ্গল। আমাদেরও পুজাতে বেলেতোড়ে যেতে মানা করলেন। আমরা সকলে পুরুলিয়ায় পুজোয় ছুটিতে মায়ের কাছে গিয়েছিলুম—মা ছিলেন আমার ছোটো ননদ-ননদাই-য়ের কাছে। ছুটির শেষ দিকে আরেকটি ঘটনা ঘটে যা যামিনীদা আর আমাদের খুব নাড়া দিয়ে যায়। আমার ছোটো ননদাই ড. কালীপদ মিত্র তখন পুরুলিয়ার সিভিল সার্জন ছিলেন—বড়ো হাসপাতাল তাঁরই দায়িত্বে। তখন জাপানি যুদ্ধের ভয় কাটে নি, বরং বাঙলা থেকে বিহারে ছড়িয়েছে। ছোটোজামাই-বাবুর একটু ভাবনা ছিল, ওঁর মনে হল বাঙলা-বিহার বর্ডারে, বাঙলা দেশেতেই একটি আস্তানা ঠিক করে রাখা উচিত, প্রয়োজনমত সেখানে ওঁর পরিবারকে (মানে মা, ছোটোদিদিমণি, আমার ভাগ্নে আর ছোটো দেওরকে) নিরাপদে রেখে আসবেন। বেলেতোড় গ্রাম ওঁর পক্ষে আদর্শ স্থান, বিশেষ করে যখন যামিনীদা সেখানে আছেন।

সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য খুব ভোরে একদিন ডাক্তারবাবু তাঁর পুরনো অভিজ্ঞ ড্রাইভার সর্দারকে নিয়ে ছোটোদিদিমণি, আমার স্বামী, কেশব (ওঁর পরের ভাই, আমার দেওর)—সকলকে নিয়ে নিজের মোটরে রওনা দিলেন। বেশি দূরের পথ তো নয়। যদিও রাস্তা খুব ভালো নয়, যুদ্ধের সময়ে, বড়ো-বড়ো ট্রাক ভারি মালসহ যাতায়াত করত বলে। বেলেতোড়ে পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না—দুপুরে একটু বিশ্রাম করে বিকেলের আগেই বেরিয়ে পড়লে বেশি রাতের আগেই পুরুলিয়া ফিরে আসবেন এই ব্যবস্থা মনে ছিল। যামিনীদাকেও সেইমতো খবর দেওয়া হয়েছিল। সিভিল সার্জনকে তাঁর নিজস্ব কাজের এলাকায় রাত্রে অবশ্যই থাকতে হবে। ব্রিটিশ আমলে প্রদেশানুযায়ী চাকরি হত। কিন্তু অনেকগুলি আশ্চর্য দুর্ঘটনা ঘটল, যদিও সবগুলিই অভিজ্ঞ ড্রাইভার সামলাতে পারলেন। কিন্তু দ্বারকেশ্বর নদীর উপর ঠিক বাঙলা-বিহার বর্ডারে রাস্তা এত খারাপ করেছে বড়ো-বড়ো ট্রাক গিয়ে যে গাড়ি আটকে গেল। সেল্‌ফ-স্টার্টার কাজ করছে না দেখে সর্দার হ্যান্ডেল বার করে নিয়ে সেটা ব্যবহার করবেন বলে যেই সেটা

ঘুরিয়েছেন—অমনি কী যে হল, একদম থেমে পড়ে গেলেন 'কোলাপস'—হার্টফেল। ডাক্তারবাবু তক্ষনি কোলে তুলে নিয়েই জমিতে শুইয়ে তাঁর যথাসাধ্য আরটিফিসিয়াল রেসপিরেশন করলেন, কিন্তু করুণায় কিছু এসব ক্ষেত্রে থাকে না প্রায়। পরে সর্দারের স্ত্রী মেনেছিলেন যে অনেক দিনই হার্ট খারাপ ছিল, ভালো চাকরি—'ছুটে যাবে' বলে ডাক্তারকে বলেন নি। ফলে অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা করে ডাক্তারবাবুর সুনামের জোরেই ওখানে আর-একটি ড্রাইভার জোগাড় হল। খুব ধীরে-ধীরে (সর্দারের মৃতদেহ নিয়ে) পুরুলিয়ায় ফেরা—থানায় রিপোর্ট করা ইত্যাদি, নানা ঝামেলা। ভাগ্য এইটুকু যে সিভিল সার্জনের টেলিগ্রাম যামিনীদার ছোট্ট বেলেতোড় গ্রামে সেই রাত্রেই পৌঁছেছিল—যুদ্ধের সময়, আর ব্রিটিশ আমল তো—আমাদের বেলেতোড় যাত্রার পুনরাবৃত্তি হয় নি—যামিনীদাকে সারারাত দুশ্চিন্তায় কাটাতে হয় নি। আমার মনে পড়ে আমার স্বামী Eliot-এর Dry Salvages-এর লাইন আওড়ে ছিলেন বাড়ি ফিরেই—The river is a strong brown God—সেই সময়েই উনি এলিয়টের কবিতাটি পেয়েছিলেন। এইসব দুর্ঘটনা ভীষণ নাড়া দিয়ে যায় জীবনে, কিন্তু এর একটি গুণও আছে: বিপদে মানুষকে কাছে টেনে আনে, একান্ত আপন করে দেয়।

এই সময় যামিনীদার মনে হল যে কলকাতায় ফিরে আসাই ভালো। যামিনীদার চিঠি:

বেলিয়াতোড়
২৭/১১/৪২

প্রিয়বরেষু,

পরশু একটা পোষ্টকার্ড দিয়েছিলুম, পটলের জ্বর কিছুতেই কমছে না, ১০৫° পর্যন্ত। নামতে ১০৩° পর্যন্ত, কষ্টও খুব। আপনার বৌদিদিরও গতকাল থেকে জ্বর এসেছে। মণি ভালো আছে। আমি একটু ভালো। এ দুর্বলতা সারতে সময় লাগবে, যদি আর জ্বর না আসে। আপনারা সকলে মানসিক ও শারীরিক সুস্থ থাকলে, এ সময়ে মনে বল পাবো। ভালবাসা জানাচ্ছি। বৌমা ছেলেদের আশীর্বাদ করছি। ইতি

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যামিনীদাদা

সেজন্যে পুজোর পরই বোধহয় ওঁরা সবাই বেলেতোড় থেকে চলে এলেন। বোধহয় তখন সকলের মনে হয়েছিল কলকাতাতেই থাকা ভালো। যা হবে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে একসঙ্গে কষ্ট করব। সহ্য করব দুঃখটা একসঙ্গে, দূরে থাকলে ভাবনা-চিন্তায় উদ্বেগে শরীর মন দুইই বিচলিত হয়ে খারাপ লাগে। তাই শত কষ্ট সত্ত্বেও বাগবাজারের গলিতেও যেন স্বস্তি। আশ্চর্য, যে ভয়ের জন্য কলকাতা থেকে সকলে ১৯৪২-এর গোড়ায় পালিয়েছিলুম, সেই ঘটনা, মানে জাপানি বোমা, পড়ল কলকাতায় ১৯৪২-এর ডিসেমবরে—একে আইরনি ছাড়া কী বলা যায়? কারণ, যখন সেই ভীতিপ্রদ ঘটনাটি ঘটল, তখন এমন কিছু হলই না—সকলে জেনে মেনে নিয়ে সহ্য করে গেলেন। কলকাতার জীবন-নদীর স্রোতের উপরে অল্পই নাড়া পড়ল। কদিন একটু কথাবার্তা হল, তারপর সবাই যেন উড়িয়ে দিল—অন্তত আমার তাই মনে হল। জাপানিদের বিরুদ্ধে কিছু গান আর ছড়া রচনা করা হয়েছিল।

যামিনীদা ফিরে আসার পর বাগবাজারের বাড়ি সরগরম হয়ে উঠল জনসমাগমে। আমি তখন বেশি যেতে পারতুম না। উনি, চঞ্চলবাবু—এঁরাই বেশি যেতেন, অনেক বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে। এই সময় অনেকেই যামিনীদার ছবি কিনতেন—আমার স্বামী অনেককে নিয়ে গিয়ে যামিনীদার ছবি দেখিয়ে মন্ত্র-মুগ্ধ করে দিতেন। আমাদের ১৯৪৩-৪৪ সালের কলকাতায় সে যে কী ভয়াবহ দিনগুলি গেছে। অনাহার অনাচার দুর্ভিক্ষের দিনগুলি, মৃত্যু চারদিকে—এখনও ভাবতে গেলে শরীর শিউরে ওঠে—সেই ভয়াবহ চিন্তাগুলি মন থেকে জোর করে সরিয়ে ফেলতে হয়। এখনও মনে পড়ে এক শনিবার, স্কুলের কাজে, সকালে আমাকে যেতে হয়েছিল কর্পোরেশন

আপিসে। আমাদের স্কুলের সামনের বাড়ির বারান্দার তলায় একজন চট পেতে শুয়ে ছিল—টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, জুলাই মাস বোধহয়—দারোয়ান আমায় বলল—বহুত দুর সে আয়া হ্যায়—কুছ খায়া নেই, থোড়ী চা। আমার খুব কষ্ট হল—আমি বললুম ডাল-ভাত দাও না। সে জানাল যে এত দিন খায় নি—সহ্য করতে পারবে না। একটু চা-ই খাবে। আমি দারোয়ানকে বললুম তাই দিতে। কাজ থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের গেটের সামনে উঠে এসেছে বৃষ্টি থেমে গেছে বলে। চা ছাড়া কিচ্ছু খেতে পারছে না। আমি একটা টাকা দিয়ে দারোয়ানকে বললুম, ভালো করে দুধ-চিনি দিয়ে চা বানিয়ে দিও, দুর্বল তো খুব—পরে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হবে। সেদিন বিকেলে আমাদের নাচ-গানের ক্লাস। জন প্রতি শনি-রবিবার লাটভবন থেকে আসতেন আমাদের বাড়ি। আমি ওঁদের চা জলখাবার দিয়ে স্কুলে গেলুম। দেখি, মানুষটি গেটের ওধারে লম্বা হয়ে শুয়ে, গায়ে ওরা চট ঢাকা দিয়েছে। আমাকে আসতে দেখেই দারোয়ান এগিয়ে এসে বলল—দিদি, মর গয়া। সেই আমার প্রথম মৃত্যু দেখা। ওই দুর্ভিক্ষ—আমি থমকে গেলুম—বুঝতে পারি নি আগে কতটা কষ্ট। আমাদের কেরানিবাবুকে ডেকে বললাম, পুলিশ-থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আসুন—মেয়েরা কী করে যাবে আসবে? সামনে এই দৃশ্য। উনি হাতজোড় করে বললেন—আমি পারব না। পুলিশ অনেক ঝামেলা করবে। আমাদের দায়ী করবে। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন। আমি যেতে পারব না থানায়, এ বিষয়ে বলতে। আমি বললুম, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, দারোয়ানকে নিয়ে আপনি যান। কিছুতেই গেলেন না—দারোয়ানও ঘাবড়ে গেছে ওঁর কথা শুনে। তাই আমি বাড়ি ফিরে এলুম—জনকে বললুম সব কথা—উনি জনকে নিয়ে এলেন স্কুলের গেটে। দেখে গেলেন, তারপর ওঁরা দুজনে টালিগঞ্জ থানায় অর্ডার লিখে দিলেন—তক্ষনি যেন মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া হয়। ওঁরা ফিরে আসার মিনিট কয়েকের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। মেয়েরা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে, মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর কিন্তু আমাদের পাড়ায় মৃতদেহ দেখে-দেখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—দেখতে পেলেই একটু দূর দিয়ে বা ভিন্ন ফুটপাত দিয়ে, মনটা বিমর্ষ করে চলে যেতে আমরা সকলেই শিখে গিয়েছিলুম—দৈনন্দিন ব্যাপার। আর রাত্রের সেই কান্না—মা ফ্যান দাও। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু (কবি, গীতিকার, সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র) যার থেকে গান করেছেন—'ফ্যান দাও! প্রাণ দাও'—আমার স্বামীর করুণ কঠিন ছড়া—'দুধেরই মতন, গেরস্ত দেয় ফেলে / গরু খায়, আর খুশী হয়ে খায়, —পেলে, / ঘরছাড়া যত বাংলার মেয়েছেলে'—যে কথা শুনে যামিনীদা কী দারুণ বলেছিলেন, জোরালো ভাষায় 'বিষ্ণুবাবুর ধ্বনি তো আলাদা।' কী আশ্চর্য কথা, আমার এখনও মনে হয়। সেই ধ্বনি আলাদা হয় বলেই তো ভিন্ন কবির ভিন্ন কবিতা। এই একই বিষয় তো পরে জেনেছি, কী করে এবং কেন এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল—কত নিরপরাধ অসহায় লোককে প্রাণ হারাতে হয়েছে, অতুলবাবুর আঁকা আশ্চর্য করুণ ছবিও দেখেছি, বিজনবাবুর (বিজন ভট্টাচার্য—নাট্যকার, অভিনেতা) "নবান্ন" নাটক তো একই সুরে বাঁধা এই দুর্ভিক্ষের চিত্র। যামিনীদারও তো একটা ছবি দেখেছি—দুর্ভিক্ষের—হয়তো এই দুর্ভিক্ষের নয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কি এমন হয়, বিংশ শতাব্দীতে। এত মানুষের অগ্রগতি সত্ত্বেও কী করে হয়? প্রশ্ন জাগে মনে অসহায়ভাবেই।

তখন কলকাতা বিদেশী পলটনে ভর্তি—অনেকের সঙ্গেই আমার স্বামীর বন্ধুত্ব হয়েছিল—জনের কথা তো হয়েছেই, মার্টিন কর্কস্তান যিনি বাঙলা ভাষার একান্ত ভক্ত হয়ে গেলেন, বাঙলা শিখে, বাঙলা কবিতা মুখস্থ করে আবৃত্তি করে অনুবাদ করে তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ দিলেন। পার্সি আর এপ্রিল মার্শাল—যাঁরা এখনও আমাদের পারিবারিক বন্ধু;

অ্যানটনি ডেনি দারুণ ফটোগ্রাফার—যামিনীদার এবং আমার স্বামীর সুন্দর ছবি তুলে সেই দিনগুলি চিরন্তন করে দিয়ে গেছেন। ডা. হেনরি ওয়েস্টাইমার, যিনি যামিনীদার প্রচুর ছবি কিনে নিয়ে গেলেন, আর আমাদের ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ক অনেক আমেরিকান বই উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন—বোধ হয় ফিরে গিয়ে তার কিছুদিন পরেই খুব অসুখ আর মৃত্যু হয়, কারণ কয়েকটা চিঠির পর আমার স্বামী ওঁর চিঠি পান নি। আইলীন এভারটন—আশ্চর্য মহিলা—আমাদের সঙ্গে পাঁতিহাল গিয়েছিলেন, সেবার যামিনীদাও গিয়েছিলেন এবং গ্রামে মেয়েদের স্কুলে নিজে তো প্রচুর অর্থ দান করেন, এবং দেশে ফিরে গিয়েও চাঁদা তুলে বাঙলা দেশের গরিব গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার জন্য অর্থ পাঠান। আমি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে চিঠি লিখি, ধন্যবাদ দিই এবং সেই অর্থ পাঁতিহাল বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাই। ডা. এডওয়ার্ড ডিমক এবং তাঁর স্ত্রী শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁরাও যামিনীদার আর বাঙলা ভাষার ভক্ত। আমাদের আর-এক বিশেষ বন্ধু এবং যামিনীদার ভক্ত জন টর্নার—যিনি বাঙালির এবং দুই বাঙলা দেশেরই ভক্ত ছিলেন। এঁরা সত্যিই এই বিপর্যয়ের মধ্যে কীভাবে এসেছিলেন আমাদের দেশের বিরাট ক্ষতিতে কিন্তু আবার আমাদের নানান উপকারে ও সাহায্যে। রাশিয়ান বন্ধুরাও যেমন। সকলেই বাগবাজারে যামিনীদার বাড়ি যেতেন, ছবি দেখতে, কিনতে। বাগবাজারের গলিটার একটা বিশিষ্ট আবহাওয়া ছিল—সরুগলির পর যামিনীদার বাড়ি ঢুকেই ছবির জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা—সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতাই বটে। আমি যতবার গিয়েছি, প্রতিবারই পুরোনোর মধ্যে নতুনের একটা ধাক্কা, নতুন কত কিছু পেয়েছি।

মধ্যে-মধ্যে মজার কথাও শুনতুম—ছোট্ট কথা, কিন্তু যামিনীদার মন বোঝা যায়। চঞ্চলবাবু আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন, মনের মিল অনেক দিক থেকেই কিন্তু বয়সে ছোটো। তবু চঞ্চলবাবু আর তাঁর বয়সের পার্থক্য, যামিনীদা এবং আমার স্বামীর বয়সের পার্থক্য থেকে কম। তবু যামিনীদার মনে হত উনিই যামিনীদার সমবয়সী, চঞ্চলবাবু অনেক ছোটো। তাই শুনেছি, যামিনীদা বলতেন: 'চঞ্চলরা ছেলেমানুষ—এই কথা আপনি আমিই বুঝব।' আরেকটা কথাও শুনেছি অনেকবার যামিনীদার মুখে: 'বিষ্ণুবাবু ইউরোপ আমেরিকা না গিয়েও সব থেকে বেশি ইউরোপীয়ান। আমি তো বহু ইউরোপীয়ান আমেরিকান দেখলুম। ইওরোপীয় গুণ ওঁর মধ্যে সব থেকে বেশি লক্ষ করি।' এই ধরনের কথা অনেকবার শুনেছি, যদিও সঠিক যামিনীদার ভাষাটা মনে নেই। যামিনীদার নিজের বিষয়েও তো এই কথাটি বলা যায়—কলকাতায় বিদেশী যাঁরা এসেছেন তাঁদেরও মন্তব্য শুনেছি—বাইরের প্রচুর লোক যামিনীদার কাছে গিয়েছেন, পৃথিবীর বহু দেশের লোক।

প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণীয় মনীষী

আজহারউদ্দীন খান

ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের যত প্রসার হয়েছে, বিদেশী পণ্ডিত আর ধর্মপ্রচারকের দলও তত বেশি মাত্রায় আসতে শুরু করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এই স্রোত আমাদের দেশে আসতে থাকে। এই বিদেশী বেনিয়া-মিশনারি-চাকুরিয়া শ্রেণীর মধ্যে অনেকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি, বিশেষ করে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি, আগ্রহশীল হয়ে উঠতে থাকেন। মুসলিম রাজত্বের পতনের পর যখন ইংরেজ ধীরে-ধীরে ভারতের প্রভু হয়ে উঠতে লাগল, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয়রা নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিল। এই পরিস্থিতিতে বিদেশীরাই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের এবং পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যে কজন এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্যার উইলিয়াম জোনসের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ওই আঠারো শতকের শেষের দিকে প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় বিলেতের রয়্যাল সোসাইটির দৃষ্টান্তে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতচর্চা ব্যাপকতা লাভ করে। সংস্কৃত ভাষার চর্চা রীতিমতো জমে উঠে এবং যাঁরা এই চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের প্রাচ্যবাদী (ওরিয়েনট্যালিস্ট) বা ভারততত্ত্ববিদ (ইনডোলজিস্ট) বলা হত। ভারততত্ত্ববিদরা লুপ্ত ঐতিহ্যকে প্রাণদান করেছিলেন—এটি যেমন ভালো দিক, তেমনি অত্যধিক ভাবপ্রবণ হবার ফলে অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য গড়ে ওঠে, এবং সেটি ক্রমশ গোঁড়ামি থেকে সাম্প্রদায়িকতার আকার নেয়। এখানে এ প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়, তবে তাঁদের প্রয়াস সর্বাংশে ভালো হয় নি—সেটিও যেন মনে রাখি।

ইংরেজি ভাষায় জোনসকে নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জোনসের প্রথম জীবনীকার লর্ড টেইনমাউথ। ১৮০৪ সালে লনডন থেকে প্রকাশিত তাঁর *Memoirs of the Life, Writings and Correspondence of Sir William Jones*; ১৯৪৬ সালে জোনসের জন্মের দ্বিশতবর্ষে দ্বিতীয় জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এ. জে. আরবেরির *Asiatic Jones : The Life and Influence of Sir William Jones*; ১৯৬২ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয় ফাতমা মুসা মাহমুদের গ্রন্থ *Sir William Jones and the Romantics*; ১৯৬৪ সালে গারল্যানড কেনন লিখিত *Oriental Jones* লনডন থেকে বেরোয় এবং তাঁর সম্পাদনায় দু খণ্ডে অক্সফোর্ড থেকে বেরোয় *The Letters of Sir William Jones*। জোনসকে নিয়ে গবেষণা করে বিদেশে অনেকেই উচ্চতম ডিগ্রিও লাভ করেছেন। আমাদের দেশে জোনসের দ্বিশততম জন্মবর্ষে একমাত্র কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি *Sir Willam Jones : Bicentenary of His Birth Comemmoration Volume* বের করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে আলোচনার ধারা পাশ্চাত্যে আজও অব্যাহত আছে, কিন্তু বাঙলা ভাষায় গ্রন্থ বেরুনো দূরে থাক, খুব বেশি লেখাজোখাও হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম জোনস সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধটি "জীবনচরিত" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তাঁর

স্যার উইলিয়াম জোনস ও অন্যান্য প্রবন্ধ—আবু তাহের মজুমদার। পুনম প্রকাশনী, ২৫৪ এলিফ্যানট রোড, ঢাকা ১২০৫। পঞ্চাশ টাকা।

প্রবন্ধ পড়েই আমরা উপলব্ধি করি যে বিদেশী পণ্ডিত ভারত ও ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে কিরূপ জিজ্ঞাসু ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যতদিন জীবিত ছিলেন··· সাতিশয় পরিশ্রমস্বীকারপূর্বক, এতদ্দেশীয় শব্দবিদ্যা ও পূর্বকালীন বিষয় সকলের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা উক্ত সমাজের কার্য উজ্জ্বল ও বিভূষিত করিয়াছিলেন।' সোমেন্দ্রনাথ বসু "বিদেশী ভারত-সাধক" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮) গ্রন্থে জোনস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন (পৃ ১-১৬)। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত "বিদেশীয় ভারতবিদ্যাপথিক" (মাঘ ১৩৭১) গ্রন্থে জোনস সম্পর্কে আলোচনা করেন (পৃ ১০-২৯)। বাঙলা ভাষায় জোনস সম্পর্কে আলোচনার এই হচ্ছে মোটামুটি খতিয়ান। সবশেষে পাওয়া গেল ১৯৮৮-র মে মাসে প্রকাশিত "স্যার উইলিয়াম জোনস ও অন্যান্য প্রবন্ধ" গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে জোনস সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ আছে এবং যেভাবে জোনসকে তত্ত্ব আর তথ্যের দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে অনুরূপ আলোচনা এ পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় হয় নি।

বইয়ের নামেই গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। জোনসের ওপর চারটি প্রবন্ধ—

১. প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ স্যার উইলিয়াম জোনস (পৃ ১-১৪)।
২. স্যার উইলিয়াম জোনস ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (পৃ ২৫-৫০)।
৩. স্যার উইলিয়াম জোনস ও ইউরোপে প্রাচ্য সাহিত্যের প্রচলন (পৃ ৫১-৭৫)।
৪. জোনসের ফারসী ভাষার ব্যাকরণের পরিমার্জনা ও মীর্জা শেখ ইতেশামুদ্দীন (পৃ ৭৬-৯৮)।

উইলিয়াম জোনস লন্ডনের এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে ১৭৪৬, ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নামও ছিল উইলিয়াম জোনস। ছোটবেলায় পিতাকে হারিয়ে মায়ের কাছে তিনি মানুষ হন। জোনসের বহুমুখী প্রতিভা ছিল, ২৮টি বিদেশী ভাষা মাতৃভাষার মতো বলে যেতেন। ফ্রান্সের সম্রাট ষোড়শ লুই তাঁর ফরাসি ভাষায় দক্ষতা দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর থেকে জোনস ফরাসি ভালো বলেন। জ্ঞানের এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে জোনস অনুপস্থিত। ১৭৮৩ সেপ্টেম্বরে জোনস-দম্পতি ভারতবর্ষে এলেন। ভারতে আসা তাঁর বহু-দিনের স্বপ্ন ছিল, 'It is my ambition to know India better than any other European ever knew it.' জোনস বিচারকের পদ নিয়ে ভারতে এসেছিলেন শুধুমাত্র ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশত। তাঁর মতো প্রতিভাসম্পন্ন লোকের স্বদেশে চাকরির অভাব ছিল না। ভারতের, বিশেষ করে বাঙলার, জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না—ভারতে এসে তিনি মাত্র এগারো বছর জীবিত ছিলেন। এই এগারো বছরে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অনুশীলনের জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি গড়ে তোলেন। বিচারকের চাকরি করেও তিনি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শিল্প দর্শন আইন-কানুন ইত্যাদি আয়ত্ত করার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের লুপ্তরত্ন উদ্ধার করে বিশ্ববাসীকে চমকিত করে দেন। কালিদাস-রচিত "শকুন্তলা" নাটকের তাঁর কৃত ইংরেজি অনুবাদ কালিদাসকে পাশ্চাত্যে বিপুল খ্যাতি এনে দেয়। প্রধানত তাঁর ইংরেজি অনুবাদ থেকেই হার্ডার জার্মান অনুবাদ করেছিলেন এবং সেই অনুবাদ পড়ে মহাকবি গ্যেটে "শকুন্তলা" সম্পর্কে বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন। ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমানের আইন-কানুন সংস্কৃত আর ফারসি ভাষা থেকে অনুবাদ করেন এবং ইসলামি আইনের বিখ্যাত গ্রন্থ ইবনে আল মুলাক্কিনের "বুগাইয়াত আল-বাহিত"-এর ইংরেজি অনুবাদ ১৮৮২ সালে প্রকাশ করেন। মাত্র এগারো বছর ভারতে অবস্থান করলেও তিনি বিপুল শ্রমে যে কীর্তি গড়ে তুলেছিলেন, সেটিই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। ভারতবর্ষে তাঁর অনেক কাজ ছিল বলে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও

ভারত ছেড়ে যেতে চান নি। তাঁর পত্নীও তাঁর সঙ্গে থেকে যেতে চেয়েছেন। স্ত্রীর শরীর দিনের পর দিন খারাপ হতে থাকায় জোনস জোর করে ১৭৯৩, ২০শে নভেম্বর লনডনগামী জাহাজে তাঁকে তুলে দেন এবং ছ বছরের মধ্যে যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে ১৭৯৫ সালে তিনিও যাবার প্রতিশ্রুতি স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি কথার কথা হয়ে রয়ে গেল। ১৭৯৪, ২৭শে এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জোনসের কর্মবহুল বর্ণময় জীবনের কথা আবু তাহের মজুমদার প্রথম প্রবন্ধে বেশ গুছিয়ে তথ্যসহ উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—এশিয়াটিক সোসাইটিকে জোনস কিভাবে প্রাচ্যবিদ্যাবিকিরণের আলোকস্তম্ভ করে তুলেছিলেন তার বিবরণ মনোরম ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে ১৮৯০ সালে রাশিয়ার সেনট পিটারসবার্গে, ১৯২৯ সালে ইল্যানডে, ১৯২২ সালে প্যারিসে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সঙ্গতভাবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জোনসের এই কৃতিত্বকে সবচেয়ে বড়ো কীর্তি বলে মনে করেছেন। লেখকও তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে এই কীর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন প্রাচ্যবিদ্যা সম্পর্কে জোনসের প্রদত্ত তথ্যগুলি ইউরোপে কিভাবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং কিভাবে নতুন-নতুন সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর রচনাবলীর সুফল শুধু এদেশে নয়, সমগ্র পাশ্চাত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেখক এই সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর সাহিত্যপ্রচেষ্টা যে বহুলাংশে সফল হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি তাঁর সমসাময়িক কবি ও পণ্ডিত, রোমানটিক ও ভিক্টোরিয়ান আমলের কবি এবং ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থকারদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছেন তার মধ্যে।' (পৃ ৬৪) প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে শুধুমাত্র নামের তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন—বিস্তৃত বিশ্লেষণ অর্থাৎ পরস্পরের প্রভাবিত অংশ উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যকে পরিষ্কার করেন নি, অথচ অন্য একটি প্রবন্ধে জসীমউদ্দীনের কবরের সঙ্গে টেনিসনের 'Locksley Hall Sixty Years After' কবিতার মিল ও প্রভাব উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। অন্যান্যদের ওপর জোনসের প্রভাব বলতে গিয়ে শুধুমাত্র নামায়ন প্রস্তুত করেই কেন তিনি ক্ষান্ত হলেন, বোঝা গেল না। প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ তথা সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল প্রাচ্যসাহিত্যসম্পদের প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তুলনামূলক সমালোচনার প্রতি আসক্ত হয়েছেন। আবু তাহের মজুমদার তাঁর তুলনামূলক সমালোচনার মূলতত্ত্বটি সূত্রাকারে বলেছেন, 'নিজের মতামতকে আরো জোরালো এবং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সকল ক্ষেত্রেই এশিয়ার কবিদেরকে পিণ্ডার, এপোলোনিয়স, ক্যালিমেকাস, থিয়োক্রিটাস এবং হোমারের মত ক্ল্যাসিক্যাল কবি-দের এবং আরও অনেক পরের কবি শেকসপীয়ারের সঙ্গে তুলনা করেন।' (পৃ ৫৬-৫৭) সমালোচকরূপে জোনসের পরিচয় আলোচ্য প্রবন্ধে খুব সুস্পষ্ট হয় নি, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনি "প্রাচ্যসাহিত্যসমালোচক জোনস" নামক প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন। চতুর্থ প্রবন্ধে ফরাসি ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে নদীয়া জেলার পাঁচনুর গ্রামের ফারসি ভাষার প্রখ্যাত পণ্ডিত—যিনি সর্বপ্রথম ইউরোপ ভ্রমণকারী—মির্জা শেখ ইতেশামুদ্দীনের অবদান ছিল কিনা, এ রহস্যের উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। *A Grammar of the Persian Language* বইটির চোরাই সংস্করণ বের করার চেষ্টা করা হয়। জোনস নাকি একজন ভারতীয়কে ব্যাকরণটি পরিমার্জনা করার জন্য দিয়ে-ছিলেন, সেই ভারতীয় প্রকাশক জর্জ নিকলকে চোরাই সংস্করণ বের করার জন্য অনুলিপি প্রণয়নে সাহায্য করেছিলেন এবং আর-একজন ভারতীয় বন্ধু তাকে উদ্ধার করেন। কোন্ ভারতীয় বন্ধু প্রতারণায়

সহায়তা করেছিলেন, কে তাকে উদ্ধার করেছিলেন, জোনস কারুরই নাম বলেন নি—তবু ঘটনাটি বলেছিলেন। আবু তাহের সাহেব এই রহস্যের উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। রহস্য রহস্যই থেকে গেছে—সাহায্যকারীর নাম কিংবা প্রতারকের নাম কোনোটাই আবিষ্কৃত হয় নি। পঞ্চম প্রবন্ধটি (প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস, পৃ ৯৯-১২১) জোনস সম্পর্কীয় চারটি প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে গণ্য হতে পারে। এই প্রবন্ধে লেখক প্রাচ্যবিদ্যার প্রসারকল্পে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা বলেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূস্বরূপ ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানি ভারতকে শোষণ করেছে, ভারতীয়দের উপর অত্যাচারও করেছে, কিন্তু তাদের প্রবর্তিত কোর্ট অব ডিরেক্টরসের মানবকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যাচর্চাবিকাশে প্রভূত সহায়তা করেছে। এই কোর্ট অব ডিরেক্টরস প্রাচ্যবিষয়ক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও রক্ষণ করার বিষয়ে যত্নবান হয়, বইপত্র প্রকাশ করার বিষয়েও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে; বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের, বিদ্বৎসংস্থাদের প্রাচ্যবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থাদি উপহার দিয়েছে। প্রাচ্যবিষয়ক চর্চার সংরক্ষণকেন্দ্র ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি লনডনে প্রতিষ্ঠা করে, এবং সেটিই আজ একমাত্র প্রাচ্যবিষয়ক প্রামাণ্য সংগ্রহশালারূপে স্বীকৃত। লেখক তাই দ্বিধাহীন চিত্তে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কাজকে সমর্থন করেছেন 'বর্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে ব্যাপক সংযোগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কোর্ট অব ডিরেক্টরসকে তার অন্যতম স্থপতিরূপে আখ্যায়িত করা যায়। শোষক হিসেবে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির মসীলিপ্ত ইতিহাসে কোর্ট অব ডিরেক্টরসের এ ধরনের মানবকল্যাণকর কাজ একটি আলোকিত অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।' (পৃ ১১১)

এ পর্যন্ত বইয়ের এক সুর ছিল, তারপর থেকেই বেসুরো বাজতে শুরু করল। আর যে-পাঁচটি প্রবন্ধ আছে সেগুলি পরস্পর-সম্পর্কশূন্য—টেনিসনের "Locksley Hall Sixty Years after" এবং "জসীমউদ্দীনের কবর" (পৃ ১১২-১২২), "লোকসংস্কৃতির ভদ্রচর্চা প্রসঙ্গে" (পৃ ১১৩-১৩১), "কাব্যে দ্বৈধ্যতা" (পৃ ১৩২-১৪৩), "স্বাধীনতা ও আমরা" (পৃ ১৪৪-১৪৭), "বীর-সৈনিক জিয়া" (পৃ ১৪৮-১৫৬)—কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নেই, বিশেষ করে "স্বাধীনতা ও আমরা", "বীর-সৈনিক জিয়া" প্রবন্ধ দুটি সাহিত্যবিষয়ক নয়। গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত বলেই কি উপরোক্ত দুটি প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করেছেন? যেখানে প্রাচ্যবিদ্যা ও জোনস সম্পর্কে লেখক পাঁচটি প্রবন্ধে বিষয়গৌরবের গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে খুচরো পাঁচরকম প্রবন্ধ নিতান্ত বেমানান। প্রবন্ধগুলির প্রতি লেখকের এক ধরনের মমত্ববোধ হয়তো আছে, যেমন পুত্রের প্রতি পিতার অপত্যস্নেহ থাকে, কিন্তু পাঠকের কাছে সেটি সর্বক্ষেত্রে মাননীয় নয়। জোনস ও প্রাচ্যবিদ্যাসংক্রান্ত বিষয়ের ওপর যে প্রবন্ধগুলি আছে তার মধ্যেও পুনরুক্তি ঘটেছে বারবার। পুনরুক্তিকেও মানিয়ে নেয়া যায় কেবলমাত্র জোনসের ওপর কোনো বই বাঙলা ভাষায় রচিত হয় নি বলে।

সবশেষে বলি, বাঙলা ভাষায় জোনসকে নিয়ে গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। আলোচ্য গ্রন্থে জোনস সম্পর্কে আলোচনাগুলি পড়ে বই লেখার যোগ্যতম ব্যক্তি আবু তাহের মজুমদারকেই আমার মনে হয়েছে। তিনি ইতিপূর্বে জোনস সম্পর্কে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছেন: *Sir William Jones: the Romantics and the Victorians, Sir William Jones and the East, Sir William Jones: a Poetical Study* এবং বাঙলা ভাষায় জোনসের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচনার সূচনাও তিনিই করেছেন। শেষ করার দায়িত্বও তাঁর। অচিরেই সেই কাজ সম্পন্ন করে আমাদের অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি পূরণ করবেন—তাঁর কাছে এই আমাদের প্রত্যাশা।

টমাস মনরোর জীবনী : একটি নিখুঁত বিশ্লেষণ

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

ইতিহাস সমষ্টির। কিন্তু ব্যক্তির ভূমিকাও অনস্বীকার্য। ইংরেজ ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির কিছু কর্মচারী কোম্পানি তথা ইংল্যানডের ভাগ্য ফিরিয়েছিলেন। ইতিহাস গড়তে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের মধ্যে টমাস মনরো (১৭৬৭-১৮২৭) অন্যতম। বার্টন স্টেইন টমাস মনরোর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন—'টমাসমনরো: দি অরিজিন অভ দ্য কলোনিয়াল স্টেট অ্যানড হিজ ভিজন অভ দ্য এম্পায়ার।' বইটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত—১. দি বিগিনিং ইন স্কটল্যানড অ্যানড ইনডিয়া, ২. বড়োমহল অ্যানড কানাড়া, ৩. কালেক্টর: দ্য সিডেড ডিস্ট্রিক্টস, ৪. ইংল্যানড, ৫. জুডিসিয়াল কমিশনার, ৬. ওয়ারিয়র, ৭. গভর্নর এবং ৮. এনড অ্যানড আফটার। এ ছাড়া আছে একটি বিস্তৃত গ্রন্থতালিকা।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বণিক ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা, বিশেষ করে, একদল ব্রিটিশ কর্মচারীর মেধা বুদ্ধি কূটকৌশল এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলল। সুতরাং সেই কর্মচারীদের জীবন আর কর্মধারার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে। সেদিক থেকে টমাস মনরোর জীবনীও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Thomas Munro : The Origins of the Colonial State and His Vision of Empire – Burton Stein, Oxford University Press. 1989. Rs. 250.

ব্যক্তিগত চিঠি আর কাগজপত্র থেকেই তাঁর স্বরূপ অনেকটা উদ্‌ঘাটিত। ১৮৩০ সালে রেভারেনড রবার্ট গ্লেইগ তিন খণ্ডে মনরোর একটি জীবনী লিখেছিলেন। সেই জীবনী থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং কর্মজীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমান বইটির লেখক বার্টন স্টেইন শুধুমাত্র রেভারেনড গ্লেইগের বইয়ের উপর নির্ভর না করে আরো অনেক তথ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর তথ্যের অন্যতম উৎস মহাফেজখানা এবং অন্যান্য অফিসিয়াল রেকর্ডস। মনরোর কর্মময় জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সংগত কারণেই তাঁর ছোটোবেলা থেকে বেড়ে ওঠা ও পারিপার্শ্বিকতা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। গ্লাসগো শহরের একজন সাধারণ ব্যবসায়ী আলেকজানডার মনরোর ছেলে টমাস ছাত্রজীবনে কৃতিত্ব দেখালেও ব্যবসার শিক্ষানবিশিতে যোগ দেন। কিন্তু আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে বৈপ্লবিক হাওয়া বইতে শুরু করলে আলেকজানডার মনরো এবং অন্যান্য ছোটো ব্যবসায়ীরা বেশ বিপাকে পড়ে। তার ছায়া ব্রিটিশ অর্থনীতিতেও কিছুটা বিপর্যয় সৃষ্টি করে:

'Glasgow, because of its dependence on the shattered American trade, led the depression in trade that was soon to affect the entire British economy.'

এই ধাক্কা মনরো পরিবারের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে এই পরিবারের ভাগ্য নতুন দিকে মোড় নেয়। এই দুরবস্থার মধ্যেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাঁরা চালিত হন ভারতে গড়ে ওঠা নতুন উপনিবেশকে কেন্দ্র করে। টমাস মনরো ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির সামরিক বিভাগে যোগদান করেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল মাদ্রাজের বড়োমহল। তাঁর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমশ ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেন এবং ইংরেজ শাসনকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মাদ্রাজের রাজ-অর্থনৈতিক বিষয়ে মনরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে বার্টন তাঁর পূর্বসূরীদের কাজ থেকে শুধু যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাই নয়, সেগুলির বিশ্লেষণও করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মনরোর প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন লেখক। এ ব্যাপারে গ্লেইগ বা অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের রচনা ছাড়াও অধ্যাপক নীলমণি মুখার্জীর "দি রায়তওয়ারি সিস্টেম ইন ম্যাড্রাস" নামক গবেষণাগ্রন্থটি মনরো-বিশ্লেষণে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, মাদ্রাজের রায়তি ব্যবস্থা সম্পর্কে মনরোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই বিষয়টি নিয়ে বার্টন স্টেইনও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন।

১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ বাঙলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই ভূমিব্যবস্থায় অনেক গলদ দেখা দেয়। এ দেশের মানুষ যেমন নানা সমস্যায় পড়েছিল, তেমনি লনডনের অনেক কর্মকর্তার মনে ছিল অসন্তোষ। তাই মাদ্রাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণা পরিত্যক্ত হয় :

'By 1807 when Munro left the Ceded Districts, on what was to have been furlough in Britain for three years, he had set forth his arguments against the adoption in Madrass of the Cornwallis system and had laid out the principles of another system of governance phrased in terms of revenue administration and law.' কারণ, 'Cornwallis system was wrong for Bengal and even more wrong for Madras.'

ভারতবর্ষ থেকে মনরো চলে যাওয়ার পর তাঁর ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য রায়তি ব্যবস্থার পরিবর্তে জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নি। কারণ ইংলনডের কর্তৃপক্ষ জমিদারি ব্যবস্থার বিরোধীই ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন, এই ব্যবস্থা রায়তি ভূমিব্যবস্থার অনেকটা কাছাকাছি। বাই হোক, মনরো দেশে ফিরে গিয়ে ১৮০৮ সালে বোর্ড অভ কনট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। অনেক টানাপোড়েনের পর মনরোর কর্মপন্থার পরিকল্পনা গৃহীত হলে তিনি আবার ভারতে ফিরে আসেন এবং তাঁর পরিকল্পনাগুলিকে কাজে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হন।

১৮১৪ সালে পুনরায় ভারতে এসে মনরো মাদ্রাজের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে মনোযোগী হন। এই কাজ চলে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কোম্পানির ডিরেক্টরদের সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছিলেন। কারণ মনরোর সংস্কারগুলি কোম্পানির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছিল। মনরোর জুডিসিয়াল কমিশনার হিসেবে কাজের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন স্টেইন। বিভিন্ন সংস্কারকর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর এবং কোম্পানির সাফল্য কিভাবে এসেছে তা তিনি দেখিয়েছেন। আর সাফল্য এসেছিল বলেই,

'Madras had been so profoundly transformed as to be considered in London a potential alternative form of regime for all of British India.'

বার্টন স্টেইন "ওয়ারিয়র" পরিচ্ছেদে যোদ্ধা হিসেবে মনরোর কৃতিত্বের কথা তথ্য-সহযোগে পরিবেশন করেছেন। মারাঠা এবং টিপুর শক্তির উৎস তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে দেশের রাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী যুদ্ধনীতি পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। বুঝতে চেষ্টা করেছেন এ দেশের মানসিক অবস্থান। শুধুমাত্র যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ—এই সহজ ধারণার বশবর্তী তিনি ছিলেন না। দেশীয় ক্ষমতা উচ্ছেদ করে পরিপূর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত তার দ্বারাই তাঁর যুদ্ধনীতি ও কৌশল পরিচালিত হত। এবং

'Munro had added to his lustre by a brilliant period of military command during the final Maratha war (1817-18)'

তাতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তিবিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

১৮২০ থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত মনরো মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। দীর্ঘদিন নানা কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যে, তিনি এ দেশের জন্য বিশেষ টান অনুভব করতেন। ১৮১৯ সালের ১২ ডিসেমবর তারিখে তাঁর বোনকে লেখা একটা চিঠি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে,

'I had no wish to ever leave...[Britain] again, but as I must return to India, I am impatient to be there. My attachment to both countries is so nearly equal, that very little turns the scale. I like the Indian climate and country much better than our own; and had we all our friends there, I would hardly think of coming home; but this country is the country of all our relations and of early life, and of all the association connected with it.

কিন্তু এই টান তো সাম্রাজ্যবিস্তারের পটভূমি তৈরির জন্যই। মনরোর কর্মধারা বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক স্টেইনের লেখায় এই সত্য যথাযথভাবে ধরা পড়ে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মনরোর দান অনস্বীকার্য। ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির সৈন্যবিভাগ থেকে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে উত্তরণ, স্বজাতির প্রতি গভীর প্রেম এবং ঘোর সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা মনরোকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী আর রাজনীতিবিদদের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর যোগাযোগ। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ-নীতি। তাই ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসন বোঝার ক্ষেত্রে মনরো এবং এ ধরনের অন্যান্য ব্যক্তিত্বের জীবনীর পর্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বার্টন স্টেইন বহু তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছেন। তিনি নিজে এই বইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লিখেছেন,

'Apart from the restoration of primary documents to scholarly use as an impetus for the present work, there were personal, professional interests that decided me upon this Munro project.'

ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত মনরো সংগ্রহও অধ্যাপক স্টেইন ব্যবহার করেছেন। এই সংগ্রহ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। যাই হোক, মনরোর বর্তমান জীবনীগ্রন্থটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস বুঝতে, বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

মধ্যযুগে ভারতীয় বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের ভূমিকা

গৌতম নিয়োগী

চুরাশি বছর অতিক্রম করেও মধ্যযুগের ভারত বিষয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক, ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক ড. জগদীশ-নারায়ণ সরকার জীবিত আছেন এবং ঐতিহাসিক মহলে এক শ্রদ্ধার আসনে আসীন। শুধু তাই নয়, এখনো, এই বয়সেও শারীরিক বাধা-বিপত্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেভাবে তিনি সারস্বত-সাধনায় মগ্ন;

Private Traders in Medieval India : British and Indian—Jagadish Narayan Sarkar. Naya Prakash, Calcutta. 1991. Rs. 250.

এখনো তিনি যেভাবে প্রাথমিক দলিল-দস্তাবেজ এবং বিচিত্র উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল মুলতানি যুগ আর মুঘল যুগ নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করে চলেছেন তা আমাদের মতো বয়ঃকনিষ্ঠ ইতিহাসের ছাত্রদের শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে বিনম্র করে। অধ্যাপক সরকার শুধু আচার্য যদুনাথের প্রিয় ছাত্রই নন, তাঁরই ঘরানার এক বিরল উত্তরসূরী। ভারতের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বিষয়ে সতেরো-আঠারো শতকের পটভূমিকায় তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বইখানি সমালোচনার জন্য আদ্যোপান্ত পাঠ করে অসামান্য পাণ্ডিত্য ও মনীষার ঔজ্জ্বল্যে আরো একবার আলোকিত হলাম।

ব্যক্তিগত বা নিজস্ব বাণিজ্য বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে আগে তা কদাচিৎ স্থান পেত। মধ্যযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রথম যিনি লেখেন, সেই ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যানড তাঁর *From Akbar to Aurangzeb* গ্রন্থে (১৯২৩) মাত্র তিন পৃষ্ঠায় বিষয় আলোচনা করেছিলেন, তা-ও পরিশিষ্ট হিসেবে। সেই বিষয়টি ড. জগদীশনারায়ণ সরকার সবিস্তারে অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন প্রায় আড়াই শ পৃষ্ঠায়। এতেই বোঝা যায়, তাঁর এ বিষয়ে দখল কত ব্যাপ্ত এবং গভীর। সে কথা আলোচনা করার আগে, একটি কথা সাধারণ পাঠকদের বলা দরকার। মুঘল যুগে বাণিজ্যের দুটি বৈশিষ্ট্য বা ধারা ছিল—আভ্যন্তরীণ বা অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য। অন্তর্বাণিজ্য দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিতদ্রব্যাদি, তার বাজার ও বিক্রিতে সীমাবদ্ধ; বহির্বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বোঝায়। এই শেষোক্ত কাজে জড়িত ছিলেন ভারতীয়, এশীয় এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁদের উপর অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ বেরিয়েছে। দেশী-বিদেশী এই লেখকদের মধ্যে হোলডেন ফারবার, পিটার মারশাল, কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী, ক্রস ওয়াটসন, সুশীল চৌধুরী, অশীন দাশগুপ্ত, সিনাপ্পা আরসরত্নম্, বালকৃষ্ণ গোখলে, ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্যামেলা নাইটেঙ্গল, ওমপ্রকাশ, মাইকেল পিয়ারসন, ইন্দ্রাণী রায়, সতীশ চন্দ্র প্রমুখ অনেক ব্যক্তি আছেন। তৎসত্ত্বেও "প্রাইভেট ট্রেড" (ফারসি ভাষায় "সৌদা-ই-খাস") নিয়ে তেমন আলোচনা হয় নি, বিশেষত মুঘল প্রাদেশিক শাসকদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিয়ে। সাধারণভাবে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির বাণিজ্য নিয়ে বহু লেখা হলেও ইউরোপীয় ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ব্যাবসা-বাণিজ্যও তেমন গুরুত্ব পায় নি। অধ্যাপক জগদীশনারায়ণ সরকার সেই অভাব পূরণে এগিয়ে এসেছেন।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে ইউরোপীয় বাণিজ্য বোঝাত শুধু পর্তুগীজ, পরে যুক্ত হয় ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসি প্রভৃতি যখন বিভিন্ন দেশে ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানি গড়ে ওঠে। যেহেতু কোম্পানির কর্মচারিগণ প্রায়-সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত ব্যাবসা করতেন গোপনে, তলায়-তলায়; দুর্নীতি যুক্ত ছিল ওতপ্রোতভাবে, তাই কোম্পানি প্রথমে এই ব্যাবসা-বাণিজ্য বরদাস্ত করত না, পরে মেনে নিলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ঐতিহাসিকেরা এই অর্থনৈতিক ইতিহাস তাই উপেক্ষা করেছেন। তাহলে কী হবে, ইউরোপীয় ব্যক্তিগত বাণিজ্য জোরদার ছিল এবং ভারতের অর্থনীতির উপর তার প্রতিক্রিয়া ছিল অবিসংবাদিত। ইতিহাসের বিষয় হিসেবে তাই ব্যাপারটি উপেক্ষণীয় নয়। সেই কারণেই ড. সরকার বিষয়টি বেছে নিয়েছেন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত ব্যাবসা-বাণিজ্য" বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন, যা ইরফান হবিব ও তপন রায়চৌধুরী-সম্পাদিত "দ্য কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্টরি অভ ইনডিয়া"র প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধটি তখন পুস্তিকাকারে ছাপা হয়ে ফুরিয়ে যায়। বর্তমান গ্রন্থটি সেই মূল পুস্তিকার চেয়ে বহুগুণ পরিবর্ধিত হয়েছে, বহু নতুন বিষয় ঢুকেছে। বস্তুত, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনা-

অংশটি সম্পূর্ণ নতুন। এ বিষয়ে তিনি অবশ্য ইংরেজি সূত্রের উপর বেশি নির্ভরশীল, কেননা

'For the private trading activities of the various sections of the Indians—the Emperors and the Nobles and the business circles, too, the English factory records constitute our mainstay, supplemented by the accounts of foreign travellers and the diaries of officers and only incidentally by Persian histories and letter books.'

আলোচ্য বইটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথমপর্বে বর্ণিত হয়েছে ইংরেজদের প্রাইভেট ট্রেড। সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই ভাগে ব্যক্তিগত ব্যাবসার সজ্ঞা, তার উৎপত্তি, প্রকৃতি, ক্রমোবৃদ্ধি, সমস্যা, কোম্পানির তরফে এই ব্যাবসা বন্ধ করার উপায়-উদ্ভাবন এবং সেগুলির ব্যর্থতা, এই ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রতিক্রিয়া সবই বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এই অশীতিপর বয়সে সারা পৃথিবীর নানা প্রান্ত জুড়ে নানা মহাফেজখানায় ছড়িয়ে-থাকা এবং বহু ভাষায় প্রাপ্তব্য অপ্রকাশিত প্রাথমিক নথি দেখা সম্ভব হয় নি। এতে কোনো দোষ দেখি না; কারণ এই কাজ বৃদ্ধ বয়সে কেন, যৌবনেও করা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য —সময়ের প্রশ্ন, টাকার প্রশ্ন, নানা দেশে যাওয়ার প্রশ্ন, সর্বোপরি নানা ভাষা জানার প্রশ্ন আছে। এই জন্যে সরকার মূলত প্রকাশিত ইংরেজি নথির উপর আকর-উপাদান গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয়ে ভুল করেন নি। তা ছাড়া, ইংলিশ ফ্যাক্টরি রেকর্ডস তো স্বর্ণখনি! তবে লেখক পূর্বোক্ত প্রবন্ধ (জার্নাল অভ দ্য বিহার সোসাইটি, ১৯৬৩ বা পুস্তিকা, সায়েনটিফিক বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৯?) থেকে বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অংশে বহু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন।

ব্যক্তিগত ব্যাবসা কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই লেখকের আলোচনা শুরু ইংরেজদের নিয়ে। ব্যাপক অর্থে এই ব্যাবসা বোঝাত

'a private speculative business, pursued by Englishmen, whether company servants or not for their own advantage i.e., for making their own fortunes, distinct from the company's East India trade carried on for its benefit, the private traders competing with the latter in certain prohibited articles both in imports and exports from Europe.'

সতেরো শতকে এটা শুরু হয়। পরে এই ব্যাবসারও যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি এই ব্যাবসার প্রতি কোম্পানির মনোভাবেরও। দ্রব্যগুলির কথাও বলা যাক—মসলিন, তুলো তথা সুতিবস্ত্র, পশম, গোলমরিচ, রেশম, কাঠ, কফি, চিনি, মশলাপাতি, ক্ষার, সোডা আরো কত কী। এই ব্যাবসা-বাণিজ্যের পিছনে নানা কারণ, এই ব্যাবসার নট-নটী, ব্যাবসার প্রকৃতি, ব্যবসায়ীদের সমস্যা (তা সে অর্থের হোক বা জাহাজের হোক) ইত্যাদি আলোচনা চিত্তাকর্ষক। কোম্পানির কর্তারা কি চুপচাপ ঘুমিয়ে ছিলেন? তা নয়, নানা ব্যবস্থা নিয়েও কিছু করতে পারেন নি। ড. সরকার সেই ব্যবস্থাগুলি ও তার ব্যর্থতার কারণগুলি দেখিয়েছেন।

বইটির দ্বিতীয় অংশ, আমার মতে, আরো বেশি। চিত্তাকর্ষক। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আগে হয় নি। বহুল প্রচলিত *The Cambridge Economic History of India*-র সঙ্গে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। মুঘল সম্রাট (সম্রাজ্ঞীই বা নয় কেন? নূরজাহানের তো বিশেষ ভূমিকা দেখতে পাই); মুঘল রাজবংশের অভিজাতগণ, বিশেষভাবে অনেক শাহজাদা; প্রাদেশিক শাসকগণ; অন্যান্য ওমরাহগণ এবং মুঘল রাজ্যসীমানার বাইরে দাক্ষিণাত্যের ব্যবসায়িগণ এই ধরনের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। ভারতীয় শাসক, ব্যবসায়ী শ্রেণী, কোম্পানি এবং তাদের কর্মচারী—এদের পারস্পরিক সম্পর্ক না জানলে

মুঘল যুগের বাণিজ্যের পুরো ছবিটাই তো পরিষ্কার হয়না। ড. সরকার নবম এবং দশম অধ্যায়ে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আরো একটি জরুরি বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা হল ব্যক্তিগত ব্যাবসা, বিশেষ ব্রিটিশ ব্যাবসায়ীদের উদ্যোগগুলির ফল—একদিকে কোম্পানির বাণিজ্যের উপর প্রভাব, অন্যদিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রতিক্রিয়া। গ্রন্থপঞ্জী বিস্তৃত, মানচিত্রগুলি মূল্যবান এবং শব্দার্থ-বোধক সূচী পাঠকদের সহায়ক। বইটির কাগজ, মুদ্রণ, বাঁধাই সবই উচ্চাঙ্গের, তবু মূল্য মনে হয় অতিরিক্ত। ফলে সুলিখিত বইটির একখানি সুলভ সংস্করণ হওয়া প্রয়োজন।

কবিতার তৃতীয় বিশ্ব

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রবীণ কবি রঞ্জিত সিংহ শুধুমাত্র কবিতা লেখেন না। তিনি একজন প্রাবন্ধিক। এ ছাড়াও এলিয়টের ফোর কোয়ার্টেটস-এর অনুবাদ করে তিনি অনুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। "নিয়ে চলো তিসিফুলের আশ্বিনে" তাঁর পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ। কবিতার ভাষা নিয়ে রঞ্জিতের পরিশ্রমী পরীক্ষা-নিরীক্ষার উজ্জ্বল উদাহরণ এই গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই আমরা পাই। অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কবিতা লেখেন না। বরং বলা যায় তাঁর কবিতা একান্তভাবেই মেধানির্ভর। নিখুঁত ছন্দবোধ আর প্রখর শব্দচেতনা—রঞ্জিতের অধিকারে আছে এই দুই অমোঘ অস্ত্র। এ দুয়ের সাহায্যে তিনি তৈরি করে নিতে পেরেছেন নিজস্ব এক কাব্যভাষা, যা তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। বিদেশী শব্দের সপ্রতিভ ব্যবহারে রঞ্জিত অত্যন্ত দক্ষ। আলোচ্য গ্রন্থ থেকে কয়েকটি উদাহরণ: (ক) 'ঝনঝন শব্দে শতাব্দীর স্টেইনড গ্লাস ভেঙে যায়।' (খ) 'বলেছিলেন আমার কবিবন্ধু, কবিতায় তোমার হোমোগ্লোবিনের / পরিমাণ বড্ড কম।' (গ) '…লুমিনাস শাড়ি পরে / একটি স্ত্রীমূর্তি কবি-বন্ধুর বাড়িতে ঢুকছে।' আবার একই সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের প্রতিও রঞ্জিতের প্রবণতা লক্ষ করি। যেমন: 'তার মাদ্দীক-শর্করা রসে বক্ষদ্রোণী / হাতিশুঁড় জঙ্ঘা, গুল্ফা ঢাকা যোনিপীঠ, লাক্ষারস দুই বাহু / কাঞ্চিকা-ভেজানো কিংপক্ক মুখ'। 'কবিতা ক্রমশ চিত্রকল্প হোক।'—এরকম ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন রঞ্জিত তাঁর একটি কবিতায়। শুধুমাত্র চিত্রকল্প নয়। চমকপ্রদ উপমা ব্যবহারেও রঞ্জিতের দক্ষতা অসাধারণ। যেমন: 'জ্বলজ্বলে টাই, যেন ফ্যাকাশে বুড়ির গায়ে আলোকরা / গার্ডেন ভারেলি,'। নিখুঁত চিত্রকল্পের একটি উদাহরণ: 'আমি যেন মস্ত ডাল, ভেঙে পড়ে আছি, / লতাপাতার জঙ্গলে মাথার ওপর দুপুরেই রাত্তির।' খুব সচেতন, আগ্রহী এবং মেধাবী পাঠক না হলে রঞ্জিতের কবিতার আপাত-জটিলতা সরিয়ে ভেতরের রস উপভোগ করা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের দুটি কবিতা—'দিদির বাড়ি' এবং 'এই জোব চার্নকের দেশে' সাধারণ কথ্যরীতির প্রয়োগে জীবনের গল্প বলতে চেয়েছেন: রঞ্জিত এই কবিতাটিতে গ্রন্থটি বাঙলা কবিতার সচল প্রবাহে একটি প্রশংসনীয় সংকলন। ব্যঞ্জনাধর্মী প্রচ্ছদটিও চমৎকার।

"কবিতা, কবিতার অনুষঙ্গ" গ্রন্থে পরিচিত কবি কিরণশঙ্কর মৈত্রর কবিকল্পনা বেশ স্বতন্ত্র আর অভিনব। ২৮টি কবিতা আছে এই গ্রন্থে। প্রতিটি কবিতার সঙ্গে আছে কোন্ মানসিক প্রক্রিয়ায় কবি এটি রচনা করেছেন তার ব্যাখ্যা। দুর্বোধ্যতাই হল আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। অতএব একালের কোনো কবি যখন নিজেই পাঠককে বোঝাতে উদ্যোগী হন 'কী ভাবে কবিতার জন্ম হয়, কোন্ ঘটনা বা প্রেরণা মর্মমূল মথিত করে শব্দবন্ধে ধরা পড়ে'—তখন আমাদের কৌতূহলী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে এ-ধরনের আর-একটি গ্রন্থের কথা স্মরণে আসে। শঙ্খ ঘোষের "কবিতার মুহূর্ত"। তবে এই দুটি গ্রন্থের উদ্দেশ্য প্রায় এক হলেও, উপস্থাপনায় অনেক ফারাক। উল্লিখিত গ্রন্থে শঙ্খ ঘোষ তাঁর মায়াবী গদ্যে পাঠককে জানাতে চেয়েছেন কী ভাবে, কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক-একটি কবিতার ভাবনা তাঁর মনে ঝিলিক মারে এবং তার-পর কী ভাবে তিনি ধীরে-ধীরে কবিতার পরিপূর্ণ শরীর গড়ে তোলেন। কিরণশঙ্কর কিন্তু কবিতা-নির্মাণের কোনো বিশ্লেষণী ব্যাখ্যায় যেতে চান নি। কোন্ ঘটনা বা অনুষঙ্গ তাঁকে কবিতাগুলির রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল—শুধুমাত্র এই তথ্যই আমরা জানতে পারি। ভাবনার পরমাণু থেকে কী ভাবে তিনি এক-একটি কবিতাকে সম্পূর্ণ করে তুলছেন—এরকম মেধাবী আলোচনা তিনি এড়িয়ে গেছেন। বরং কোনো-কোনো কবিতার পরিপ্রেক্ষিত বোঝাতে গিয়ে তিনি অকারণ কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন—যা পাঠকের পক্ষে অস্বস্তিকর। যেমন, একটি কবিতার প্রসঙ্গে তিনি আমাদের জানান—'উচ্চপদস্থ এক প্রবাসী সুধী বঙ্গভাষী কবিতাটি অফিসে তাঁর টেবিলে কাঁচের নীচে রেখে দিয়েছিলেন।' অন্য আর-একটি কবিতা-প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি: 'ওয়েষ্ট জার্মানি থেকে এক বাঙালী পাঠক আমাকে চিঠি লিখে……কবিতাটির প্রতি তাঁর অনুরাগ জানিয়েছিলেন।' যাই হোক, এইসব শিবের গীত বাদ দিয়েও বলা যায়—রোমানটিক মেজাজের কবি কিরণশঙ্কর শব্দব্যবহারে বেশ সহজ আর সঙ্গীব। তাঁর কবিতা সহজেই পাঠকের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপন করে। গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'চিত্রল হরিণী' চিত্রকল্পের নিপুণ ব্যবহারে উজ্জ্বল। অব্যর্থ শব্দসন্ধানে কবির অসহায় আক্ষেপ: 'আমি এক ব্যর্থ ব্যাধ / আমার চোখের সামনে / ছুটছে ছুটতে পালায় অধরা শব্দ / চিত্রল হরিণী।' কিন্তু এই সফল কবিতাটির অনুষঙ্গে কিরণশঙ্কর যখন আমাদের জানান: "'দেশ" পত্রিকায় আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতা "চিত্রল হরিণী"'; তখন আমাদের মনে হয় কবিতাটির জন্যে আরো একটু বেশি মর্যাদা তিনি আশা করছেন। গ্রন্থের বেশির ভাগ কবিতাই পাঠ্যযোগ্য। রূপ আর নিসর্গের প্রতি নিবিড় মুগ্ধতা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ঝোলানো কাঁধের ব্যাগে নিয়েছি দুপুরের রোদ / ঝিলের অপরাহ্ণ ভরে থাক দু'চোখে তোমার, / যেখানে দাঁড়াও তুমি সেই তো মন্দির / তোমাকে যা দিতে যাই হয়ে যায় ফুল।'

যাট দশকের শেষভাগে বোধহয় অমিতাভ গুপ্ত কবিতা লেখা শুরু করেন। নিরন্তর সৃষ্টিমুখর এই কবির এযাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নটি। এ ছাড়াও

১। **নিয়ে চলো তিসিফুলের আশ্বিনে**—রঞ্জিত সিংহ। পরমা, ৩৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। দশ টাকা॥ ২। **কবিতা, কবিতার অনুষঙ্গ**—কিরণশঙ্কর মৈত্র। প্রমা প্রকাশনী, ৫ ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-১৭। বারো টাকা॥ ৩। **মাতা ও মৃত্তিকা**—অমিতাভ গুপ্ত। রক্তকরবী ১০/১বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দশ টাকা॥ ৪। **খরা ও যমুনা**—অমিতাভ গুপ্ত। প্রতিভাস, ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২। বারো টাকা॥ ৫। **সূর্যে ধ্বনিপাটে**—অমিতাভ গুপ্ত। ডি. এন. পাবলিকেশন, ১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (দ্বিতল)। দশ টাকা॥ ৬। **যুক্তিশৃঙ্খল**—অমিতাভ গুপ্ত। শিল্পসাহিত্য, ৪৯ পটলডাঙা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দশ টাকা॥ ৭। **ভ্রমণকাহিনী**—জয়দেব বসু। প্রমা প্রকাশনী। বারো টাকা॥ ৮। **তৃতীয় বিশ্বের কবিতা**—সমাজ গবেষণা একাডেমী। ২/জি শ্যামলী ঢাকা। ষাট টাকা॥ ৯। **রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা**—সাগর পাবলিশার্স, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০। ষাট টাকা (বাঙলাদেশ), তিরিশ টাকা (ভারত)॥ ১০। **লুব্ধক**—নিতাই জানা। কারবেলা, তমলুক, মেদিনীপুর। দশ টাকা॥ ১১। **কবন্ধ কনিক**—অজিত বসু। সীমান্ত, ৬সি রাজকুমার চক্রবর্তী সরণী, কলকাতা-৯। বারো টাকা॥

তিনি নানা প্রবন্ধে কবিতা-বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রমাণ রেখেছেন। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে "উত্তর আধুনিক"—এই পরিভাষা ব্যবহার করে অমিতাভ এক বিদগ্ধ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছেন। "অবক্ষয়ী আধুনিকতা" (অমিতাভের মতে, পঞ্চাশের কবিদের থেকে যার শুরু) বর্জন করে বা অতিক্রম করে বিশেষ কয়েকজন কবি কবিতায় জীবনশিল্পের চর্চা করে চলেছেন। এদেরই অমিতাভ "উত্তর-আধুনিক" আখ্যা দিয়েছেন। অমিতাভর যুক্তি অনুযায়ী, উত্তর-আধুনিক কবিরা বিদেশী কাব্যতত্ত্ব বা প্রকরণকৌশল অগ্রাহ্য করে দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, এভাবেই বাঙলা কবিতার মূল শিকড়টিকে একদিন চিনে নেওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হল এজন্য যে—অমিতাভর মতো পরিশীলিত ভাবনাপ্রতিভার একজন কবিকে বুঝে নিতে হলে তাঁর চিন্তার বিষয়ে পাঠকদের কিছু জানা প্রয়োজন। তিনি দেশজ লোকগাথা আর পুরাণ-কাহিনীর নিপুণ ব্যবহারে স্বকীয় কাব্যভাষাকেও ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী করে তুলেছেন। মনন-নির্ভর অমিতাভর কবিতা সবসময়েই সতর্ক, সচেতন নির্মাণ। তিনি বিশ্বাস করেন : 'নির্মাণের মূলে যে প্রকরণপ্রয়াস তাকেই কবিতা বলে।' আলোচ্য "মাতা ও মৃত্তিকা" গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার পরিপ্রেক্ষিত মহাভারতের কাহিনী, উপকাহিনী। প্রাচীন পুরাণকে বর্তমান জীবনের জটিল ছন্দে মেলাতে চাইছেন তিনি। মহাভারতের নানা চরিত্রের নামে কবিতার শিরোনাম। যেমন—'মাদ্রী', 'অম্বালিকা', 'গান্ধারী', 'বিদুরের গান', 'শ্রীকৃষ্ণের বোন', 'যশোদার ছেলে' ইত্যাদি। 'অপেক্ষা : বিদুরের ঘর' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আমার শাকান্ন বলতে যতটুকু / ভাগ করে দেব / আমার আনন্দ তুমি ময়ূরমুদ্রায় তুলে নিয়ো / এসো, শ্রাবণের মেঘে / কুরূপে, খরার মাঠে এসো।' এখানে পৌরাণিক চরিত্র বিদুর বর্তমান ভারতবর্ষের দরিদ্রশ্রেণীর প্রতিভূ। একজন কৃষক বৃষ্টির প্রত্যাশী। মহাভারতের কাহিনীতে দরিদ্র বিদুরের ঘর ভগবান কৃষ্ণের আগমনে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আধুনিক কালের একজন কবির কাছে শ্রাবণের মেঘ, মেঘনিঃসৃত জল—এসবই হল ভগবানের প্রতীক। বৃষ্টি এলে খরা কাটবে। দরিদ্র কৃষকের ঘর ভরে উঠবে উজ্জ্বল শস্যের আলোয়। বাঙলা কবিতায় দেশজ ঐতিহ্যের সচেতন অনুসন্ধান বিষ্ণু দে-র পরে সম্ভবত অমিতাভই আবার নতুন উৎসাহে শুরু করেছেন। "খরা ও যমুনা" গ্রন্থের একটি কবিতায় উত্তরসূরীদের কাছে তাঁর আবেদন : 'তরুণ কবিরা যেন বালি খুঁড়ে জলাশয় টানে'। এই একই গ্রন্থের অন্য একটি কবিতায় তাঁর প্রার্থনা : 'আহার করুক জল / আমাদের ভাষা-গভীরতা / এই জল পিপাসাবশত / পান করে নিক সব কথা'। বিষ্ণু দে-ও এভাবে একদিন বলেছিলেন : 'জল দাও আমার শিকড়ে'। ছন্দ-ব্যবহারে নিপুণ অমিতাভ ছন্দের নানা প্রয়োগ নিয়ে নিরলস পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। সংলাপধর্মী ভাষাকে মাত্রাবৃত্তের আলগা বাঁধনে উপভোগ্য করে তোলার একটি উদাহরণ : 'কালকে ত্রিকূটের চূড়োতে / উঠতে পারা গেলে শান্তি / ত্রিকূট না হলেও ক্ষতি নেই / বিষ্ণু দে-র দেখা পাব তো'। এই গ্রন্থের 'রাস' কবিতাটিও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির আশ্চর্য বিভায় ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক বোধ তার কালো চরিত্র হারায়। মুগ্ধ চোখে অমিতাভ দেখেন : ...'গ্রাম্য, নীচুপথে / বাঁক নিয়ে ফিরতেই চোখে পড়ে রাসপূর্ণিমার আলো / পড়েছে মস্‌জিদে'।

মোট ২৬টি কবিতা নিয়ে অমিতাভর আর-একটি কাব্যগ্রন্থ : "সূর্যে ধ্বনিপটে"। মিথকথন, ছন্দের চোরাটান, শব্দকে একাধিক প্রতীকী অর্থে ব্যবহার—এই গ্রন্থের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য। বলা যায়—'জবার পাপড়ির মতো কবিতার ভাষা'। এই গ্রন্থে তিনি যেন কিছু বলতে চান নি। শুধু সূক্ষ্ম আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন—'রূপ ভেঙে রূপার্তের টান'। গ্রন্থের শেষ কবিতা "কাশফুল" ১৪টি কবিতাচূর্ণের সমন্বয়ে এক অপরূপ ভাস্কর্য। এখানে—'নৌকো', 'নদী', 'সমুদ্র', 'কাশফুল'—সব কিছুই প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। 'ধ্বনিপট' কবিতাটি একটু বিশদভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'উড়ে যায় যে—পেঁচার ছায়া/পেঁচা বসে থাকে/অন্ধকারে, বিতোল গাছের মগডালে/অন্ধকারে, চাঁদ পুড়ে যায়'। কবিতাটিতে 'পেঁচা' যেন সেই অবক্ষয়ী আধুনিকতা বা অপসংস্কৃতির প্রতীক। যার অশুভ প্রভাবে বেড়ে ওঠা 'বাংলার খোকাখুকু' ভ্রান্ত আবেশে দাবি জানায়—"'মাগো, আরো পেঁচা খুলে দাও'"—। "যুক্তিশৃঙ্খল" কাব্যগ্রন্থের নামকরণ কেন এরকম হল সে প্রসঙ্গে অমিতাভ গদ্যফর্মে চারটি কবিতা লিখেছেন। এই গ্রন্থটির কবিতাগুলি পড়ে আমাদের মনে হয়—'সৌন্দর্য বিস্তৃত হয়, বেদনাও হয়ে ওঠে সাংকেতিক।' একটি কবিতায় তিনি আমাদের জানান—'আমি, এই পুরাণকথক/আরো কিছু গল্প বলে যাব'। রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গিতে তিনিও উদাত্ত কণ্ঠে বলেন—'সূর্যে ধ্রুবতারার কাছে/সমুদ্রে পর্বতে/আমার প্রাণের অসীমতা/অসীম হয়ে জাগে'। তবে ক্ষমতাবান এই কবিকে আমাদের কিছু বলবার আছে। তাঁর কোনো-কোনো কবিতা মনে হয়,—শুধুই শব্দের মায়াজাল আর ছন্দকুশলতার অনুশীলন—পাঠকের সঙ্গে সংযোগ-স্থাপনের ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর ভাবা উচিত। আর অতিরিক্ত মেধার ভার কবিতার সজীবতা নষ্ট করে—এটাও বোধ হয় তাঁর মনে রাখা উচিত। আলোচিত চারটি গ্রন্থই সুমুদ্রিত। "যুক্তিশৃঙ্খল" গ্রন্থের প্রচ্ছদে অজন্তা ১নং গুহাচিত্র খুবই আকর্ষণীয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-কে উৎসর্গ-করা "ভ্রমণকাহিনী" মেঘদূত-খ্যাত জয়দেব বসুর আর-একটি কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই জয়দেব তাঁর পার্টির প্রতি আনুগত্য সরাসরি প্রকাশ করেছেন। যেমন : '...সমাজতন্ত্র, তুহুঁ বিনা আমি যে বাঁচি না।' কিংবা—'যতক্ষণ তবু এই সি পি এম পার্টি রয়ে যাবে, কলম ঘষটানো আর যে কোনো কবিতা থেকে আমাকে নিবৃত্ত করা নেহাতই অলীক। আমরা কাডার, এটা জানেন নিশ্চয়।' কবিতা লেখা শুরু করার খুব অল্প দিনের মধ্যেই জয়দেব তাঁর সপ্রতিভ বাচনভঙ্গির বিক্রমে আর আঙ্গিক ও ছন্দের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাঙলা কবিতার ভূগোল পালটে দিতে চলেছেন। শব্দকে জয়দেব ব্যবহার করেন কার্তুজের মতো। কোনো-কোনো বিখ্যাত কবির পরিচিত ও বহুপঠিত কবিতার লাইন জয়দেব নিজের কবিতায় ব্যবহার করেন আশ্চর্য দক্ষতায়। উদাহরণ : 'ভ্রূপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে ব্রিগেড প্যারেডে। এটুকুই স্বনীলস্বীকার। শুধু বলো, এই হাত ছুঁয়েছে তোমার মুখ, আমি কি নিশান ছাড়া এই হাতে ছুঁতে পারি অন্য কোনো কিছু?' পুরাণের প্রেক্ষাপটে বর্তমান জীবনপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করার বিদগ্ধ প্রয়াস—আমরা জয়দেবের কবিতাতেও লক্ষ করি। 'রাধেয়-অধিরথসুত' কবিতাটিতে জয়দেব মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র কর্ণের পতনের একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। 'শূদ্রের ঐতিহ্য' পেছনে ফেলে কর্ণ 'রাজন্যের দলভুক্ত' হতে চেয়েছিলেন। সমাজের যে শ্রেণীতে লালিত হয়েছিলেন, সেই অন্ত্যজ শ্রেণীকে ভুলে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। এবং তাই জয়দেবের স্পষ্ট কর্ণের বিলাপ : 'এই পাপে ডুবে যাবে আমার গতির চাকা, ভুলে যাব অতি চেনা শস্ত্রেরও নাম।' নিঃসন্দেহে এটি কর্ণ-চরিত্রের একটি মৌলিক বিশ্লেষণ।

সমাজ গবেষণা একাডেমী সম্পাদিত "তৃতীয় বিশ্বের কবিতা" এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কবিতার অনুবাদগ্রন্থ। মোট ৫১টি দেশের ৭৮ জন কবির কবিতা আছে গ্রন্থটিতে। তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত কোনো-কোনো দেশের বিখ্যাত কবিদের কবিতার অনুবাদগ্রন্থ বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হলেও একটি গ্রন্থের পরিসরে প্রায়

সমস্ত দেশের কবিদের হাজির করার এরকম এক বৃহৎ প্রয়াস এর আগে আমাদের নজরে আসে নি। ওপার-বাঙলার প্রথিতযশা কবি ও লেখক হায়াৎ মামুদ-কৃত ভূমিকায় তৃতীয় বিশ্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভূমিকাটি খুবই যথাযথ, সুলিখিত। তৃতীয় বিশ্বের প্রধান সমস্যাগুলির কয়েকটি হল—দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিক্ষার অভাব। কঙ্গোর কবি জানো ভাইদার কবিতায় আমরা তৃতীয় বিশ্বের একটি নিটোল ছবি পাই : 'এখানে কোনো স্বপ্নের ঘর নেই / এখানে নেই পরিপাটি রেশমের সকাল। / এখানে হৃদয়ের গভীরে টুকরো হয় / অসংখ্য শব্দের ছবি।' তবে সংকলনের সব কবিতাই যে খুব উন্নত মানের, তা বলা যায় না। অনেক কবিতাতেই আছে আবেগ-দীপ্ত চিৎকার যা কখনো-কখনো শ্লোগানের মতো শোনায়। এমনকী চিলির কবি নেরুদা, নাইজিরিয়ার ওল সোয়েংকা বা কিউবার নিকোলাস গিলেনও যে প্রচারপ্রবণ কবিতা লিখেছেন, তার প্রমাণ এই গ্রন্থে আছে। বরং কিউবার আরেক কবি চেরিসিয়ানের একটি ছোটো কবিতায় তৃতীয় বিশ্বের প্রকৃত অভীপ্সা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে—'প্রয়োজন : একটা পৃথিবীর / যেখানে— / যেখানে পুলিশ / খোঁজ করে না / কোনো মানুষের / এশিয়া আফ্রিকা / অথবা লাতিন আমেরিকায়।' ভারতবর্ষের অমৃতা প্রীতমের কবিতাও বেশ ভালো : —'যেখানেই, স্বাধীনতার দেখা পাবে তুমি / সেখানেই তো আমার ঠিকানা।' অনুবাদে খুবই যত্ন নেওয়ার ফলে প্রতিটি কবিতাই বেশ সাবলীলভাবে পড়ে ফেলা যায়। তবে গ্রন্থের শেষে অসম্পূর্ণ কবিপরিচিতি (যা কেন অসম্পূর্ণ সম্পাদনা পরিষদ তাঁদের 'কৈফিয়ত'-এ ব্যাখ্যা করেছেন) না থাকলেই ভালো হত। প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ও গ্রন্থের ভেতরে মুদ্রিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার তিনটি প্রতীকী ছবির প্রিনট গ্রন্থটির আভিজাত্য বাড়িয়েছে।

"রেজাউদ্দিন স্টালিনের কবিতা" কবির ছটি কাব্য-গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ। রেজাউদ্দিনের কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রাধান্য। অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা রচনা করেন তিনি। ফলত তাঁর উচ্চারণ গাঢ়, গীতল, ও প্রাণবন্ত। অস্তিত্বের সংকটে আহত রেজাউদ্দিন অশান্ত সময়কে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করতে চান। আধুনিক জীবনের জটিল সময়গ্রাস্থ এভাবেই ব্যাখ্যা পায় তাঁর কবিতায় : 'আমার সময় গো-ক্ষুরের মতো বিভাজিত / মুহূর্তগুলো কালো কৃষকের পায়ের মতো ফাটা'—। এবং—'আমার চারপাশে বিষণ্ন, ধ্বংসস্তূপ রূপালী মাছের সমাধি / নিহত বৃক্ষের শব'—। চিত্রকল্পের ব্যবহারেও রেজাউদ্দিন পাঠককে চমকিত করেন। যেমন : (ক) 'মৃত্তিকাশিশুর টানে আকাশের স্তন থেকে / শিশিরের দুধ ঝরে রক্ত ঝরে' (খ) 'নিরালোক অবস্থানে জ্যোৎস্নার ঘোড়া এসে ঘাড় কামড়ে দেয়'। এই কবির কবিতায় আমরা প্রায়ই এক অস্থির পথিকের ছবি পাই। প্রকৃত সত্যের সন্ধানে তিনি যেন বিরামহীন হেঁটে চলেছেন। 'অনেক দরজা ভেঙে একটি ঘরের দিকে যাওয়া'। বলিষ্ঠ চেতনার কবি রেজাউদ্দিন যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েও আমাদের আশ্বাস দিয়ে যান : 'জণ্ডিস রোগীর মতো অসুস্থ মানবতা / পোড়া কাগজের মতো অকেজো অর্থনীতি / ছিন্নভিন্ন হবে'—। এবং একদিন '…শান্তি হবে / ছায়া হবে সুস্থ মানবতা'।

নিতাই জানা-র "লুব্ধক" কাব্যগ্রন্থের ২৬টি কবিতাই ছন্দে লেখা। মাত্রাবৃত্তে নিতাইয়ের দক্ষতা প্রশংসনীয়। গ্রন্থের কবিতাগুলিকে তিনটি পর্বে ভাগ করার ব্যাপারেও যথেষ্ট পরিকল্পনার ছাপ আছে। গ্রন্থের শুরুতেই মহাভারতের বনপর্ব থেকে উদ্ধৃতির ইঙ্গিতে নিতাই পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে তিনি মহা-কাব্যিক ঐতিহ্যের সাথে সমসাময়িক জীবনের সূত্র-সন্ধানী। তাঁর কবিতা, সংক্ষেপে, গ্রামীণ জীবনের ছন্দোবদ্ধ চলচ্ছবি। সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার খুঁটিনাটি নিতাইয়ের বর্ণনার চিত্রল গুণে রূপময় হয়ে ওঠে : 'ছোটো-ছোটো ঘর, দীপ জোনাকির, ছোটো-ছোটো দোর ; / মেয়েটির দুটি হাত উঁচু হয়ে খুলেছে শিকল।' 'মা' কবিতায় নিতাই আমাদের উপহার দেন গ্রামবাঙলার অন্ধকার কোণে বেঁচে থাকা, সংসারের ভারে বিপর্যস্ত এক সর্বজনীন মায়ের ছবি : —"হলুদ বাটার ধ্বনি ওঠে ঠকঠক / 'দাঁড়া বাছা তোকে দুধ দেবো জ্বালি কুপি' "—। ভূমিহীন মানুষের যন্ত্রণাও রূপ পায় তাঁর কবিতায়—'তবুও ছুটি যদি কোথাও পাই / একটু জমি একটু ডাঙা'—। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই এক ধরনের ছন্দে রচিত হওয়ার ফলে পাঠকের ক্লান্তি আসে। আর ছন্দের অন্ত্যমিলের দিকে কবি অত্যধিক মনোযোগী হওয়ায় কয়েকটি কবিতা শব্দের প্রাণহীন বিন্যাস বলেও মনে হতে পারে। একটি কাব্যগ্রন্থে নানা ধরনের কবিতা থাকা উচিত।

অজিত বসুর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ : "কবন্ধ কনিষ্ক"। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কথা বলতে পছন্দ করেন অজিত। অজিতের প্রধান সম্পদ তাঁর তীক্ষ্ণ এবং অনুসন্ধানী দৃষ্টি। নীতিহীন, আদর্শহীন, শ্রীহীন সমাজের কুৎসিত চেহারা অজিতের কবিতায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। জীবন বিষয়ে তাঁর কোনো রোমানটিক ধারণা নেই। ভান-হীন এক ঝাঁঝালো ভঙ্গিতে অজিত জীবনকে বিদ্রূপ করেন এইভাবে : 'নানা খুঁত, / তারই মধ্যে মৃত্যু জীবন মিলে / ঘৃণ্য অদ্ভুত ; / মরে যেতে যেতে বেঁচে / আছে মুখ খিঁচে।' মুখোশপরা মানুষের মেকি নীতি-বাদকেও ব্যঙ্গ করেন তিনি এইভাবে : 'নোংরা ঘেঁটে / ঝেঁটিয়ে যাঁরা সব পরিষ্কার করতে চেয়ে-ছিলেন, / তাঁরাই গোপনে / সরকারি হোটেলে / হুইস্কিসহযোগে / ক্যাবারে নাচ দেখছেন।' তবে অজিতের কবিতাতেও বৈচিত্র্য খুব কম। ইয়ার্কি, ঠাট্টা আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা পড়তে-পড়তে পাঠক অবসাদ বোধ করতে পারেন। মাঝে-মাঝে তাঁর কবিতা পদ্যের নীচু মানে নেমে যায়। একটি উদাহরণ : 'বন্ধ কর্ নাক খোঁটা— / ম্যাগো। শিকনি! / মেয়েটি বললে : যাবে, না খাবে ঠ্যাঙানি ?' কাব্যের ভাষা সম্বন্ধে কোনো সংস্কার না রেখেই বলা যায় একে আমরা কবিতা বলব না। নিজের কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে না চেয়ে অজিতের উচিত ভাষাকে আরো মার্জিত করে নেওয়া।

দলিত মানুষদের নেতা ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্মদিন ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই সংখ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীডার দেবী চ্যাটার্জির নিবন্ধটি মুদ্রিত।

আঙ্গামী সংস্কৃতি

কিরণশঙ্কর মৈত্র

এ কাহিনী বহুদিন আগের। সেলুপভ্রা আঙ্গামী বিবাহ-বহির্ভূত স্বেচ্ছাচারের মধ্যে এক শিশুকন্যার পিতৃত্ব লাভ করেছিল। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে এই অবৈধ কন্যার ব্যাপারে সেলুপভ্রার মন ছেয়ে গেল গ্লানি আর লজ্জায়। তাই সে এই আত্মজাকে সর্বদা সঙ্গোপনে গৃহকোণে রেখে দিত।

কিন্তু ধীরে-ধীরে বহুবসন্তের আনাগোনার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির দেহে যৌবনের বান ডাকল। তখন পিতা সেলুপভ্রা কন্যাকে ডেকে বাইরে যাবার আদেশ দিয়ে বলল—'যাও, ঘরের বাইরে গিয়ে যাকে পাও নিয়ে এসো।'

মেয়ে ক্রিমিনো ঘরের বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক অনেক খুঁজল, কিন্তু কাউকে পেল না। অথচ পিতার আদেশ তাকে নিয়ে যেতেই হবে। শৈশব থেকে যে আবেষ্টনীতে সে বড়ো হয়ে উঠেছে, তাতে পিতা সম্বন্ধে তার মনে ভীতির অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনো অনুভব ছায়া ফেলতে পারে নি। তাই শেষ পর্যন্ত আর কিছু না পেয়ে রাস্তায় একটা কুকুর দেখে সেটাকে নিয়েই বাবার কাছে ফিরে এল।

কুকুরটার শরীর বিরাট, চোখের মধ্যে সাদা দাগ।

মেয়ের পছন্দ দেখে সেলুপভ্রা অবাক! ক্রিমিনোকে ডেকে সে বলল—'বাছা, এই কুকুরই যদি তোমার মনের মতো হয়—তবে এই কুকুরকেই বিয়ে করতে হবে তোমাকে।'

মেয়ের প্রতিবাদ করার সাহস ছিল না। বাপের কথা মেনে নিয়ে ক্রিমিনো সত্যিই বিয়ে করল সেই কুকুরকে। বিয়ে হয়ে গেলেই বাপ এই নবদম্পতির জন্যে একটা নৌকা জোগাড় করল। নৌকাতে কয়েক দিনের খাবার দিয়ে সে মেয়ে-'জামাই'কে নির্দেশ দিল কোনো দূর ভূখণ্ডে যাত্রা শুরু করার।

দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য যাত্রার পরেই এই অভিনব দম্পতির নৌকা ভিড়ল এক নির্জন উপকূলে। নৌকা থেকে নেমে সেখানেই তারা স্থায়িভাবে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বানাল। শুরু হল তাদের সংসারযাত্রা, এবং বর্ষপরিক্রমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ভরে উঠল অনেকগুলি সন্তানের কলকাকলিতে।

বহু বছর পরে হঠাৎ একদিন সেলুপভ্রার মনে হল—তাই তো, বিয়ের পরে মেয়ে-জামাইয়ের তো কোনো খোঁজ নেওয়া হয় নি। সে তখনই বার হল মেয়ে-জামাইয়ের সন্ধানে। কিন্তু কোথাও তাদের খবর না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরে এল। তবু সে একেবারে হাল ছেড়ে দিল না। বস্তিবাসী উপজাতির লোকেদের কাছে প্রায়ই সে মেয়ে-জামাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করত—যদি তাদের কেউ কখনও কোনো হদিস দিতে পারে। আর এইভাবে খোঁজ করতে-করতেই প্রতিবেশীদের একজন জানাল সে ঝানজি নদীর দূর প্রত্যন্তে অরণ্যের মধ্যে সে মানুষের স্বর শুনতে পেয়েছে।

সেলুপভ্রা খবর শুনে তখনই রওনা হল ঝানজি নদীর দিকে। তারপর অনেক চেষ্টায় এক সময় সে খুঁজে বার করল মেয়ে-জামাইয়ের আবাসস্থল। সেলুপভ্রা তাদের ঘরের দিকে যেতেই তার কুকুর-জামাই ঘেউ-ঘেউ করে তাকে স্বাগত জানাল।

সেলুপভ্রা ঘরে যেতে তার মেয়ে যত্ন করে বসাল, খেতে দিল নানারকম ফল আর বুনো শুয়োরের মাংস। খেতে-খেতে সেলুপভ্রা তার নাতি-নাতনিদের দেখতে চাইল। ক্রিমিনো নাম ধরে ছেলে-মেয়েদের ডাকল। ডাক শুনে সবাই ছুটে এল কাছের বন থেকে খেলা ফেলে। সেলুপভ্রা দেখল তার নাতি-নাতনিদের সবার গায়ের রঙ সাদা। এমন ধবধবে সাদা রঙ আগে সে কখনও দেখে নি।

মেয়ে-জামাইয়ের কাছে কয়েক দিন কাটিয়ে নাতি-নাতনিদের আদর করে ঘরে ফিরল সেই আঙ্গামী নাগা। ফিরবার আগে সে আমন্ত্রণ জানিয়ে এল—বড়ো হলে তারা যেন দাদুর কাছে আসে আঙ্গামী বস্তিতে।

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। আর কে জানে—কখন আঙ্গামী নাগাদের মধ্যে এক অদ্ভুত ধারণা গড়ে উঠেছে: শ্বেতাঙ্গ মানুষেরা ওই অভিনব দম্পতির (সারমেয় স্বামী আর আঙ্গামী স্ত্রীর) ছেলে মেয়েদের বংশধর। এই বিশ্বাস লোকপরম্পরায় এখনও প্রশ্রয় পেয়ে আসছে অতীতমুখী নাগাদের জীবনে।

এটি হল নাগাভূমির অন্যতম প্রধান উপজাতি আঙ্গামীদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোককথা। এই উপকথাটিকে উদ্ভট এবং গ্রোটেস্ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই অদ্ভুতত্বের মধ্যেই আদিম নাগা বৈশিষ্ট্যের প্রতিভাস।

প্রসঙ্গত, আঙ্গামী নাগারা সারমেয়-মাংসের অনুরাগী। একটি কুকুরকে বেশ করে ভাত মাংস খাইয়ে তারপর তাকে জীবন্ত রোস্ট করে, তার পেট কেটে সেই ভাত মাংস বার করে খাওয়া একটি অতি উপাদেয় আহার (ডেলিকেসি) তাদের কাছে।

ক্ষীণকায়া উচ্ছ্বসিত তটিনী, শ্যামল পর্বতশ্রেণী, সদা পরিবর্তমান বিচিত্র মেঘপুঞ্জ, সর্পিল পথবীথি আর সর্বোপরি বিভিন্ন-উপজাতি-অধ্যুষিত শৈলরাজি নাগাভূমি ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যতম কনিষ্ঠ, ষোড়শ অঙ্গরাজ্য।

এই পার্বত্য রাজ্যের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় আট লক্ষ! চোদ্দটি প্রধান উপজাতির বাস এখানে—আও, আঙ্গামী, সেমা, লোথা, রেঙ্গমা, চাখেসাঙ্গ, সাঙ্গটাম, য়িমচুঙ্গের, কনিয়াক, ফোম, চাঙ্গ, জেলিয়াঙ্গ, কুকি ও খিয়ামুনগান। এ ছাড়া রয়েছে পোচুরি, কাচারি প্রভৃতির মতো কয়েকটি অপ্রধান উপজাতি।

কোহিমা, মোককচাঙ্গ, টুয়েনসাঙ্গ, যোখা, জুন-হেবোটো, ফেক আর মোন—এই সাতটি জেলা নিয়ে নাগাভূমি গঠিত।

নাগাভূমির রাজধানী কোহিমা। কোহিমা শহরের জনসংখ্যা প্রায় ছত্রিশ হাজার। কোহিমায় আঙ্গামী নাগাদের প্রাধান্য (যেমন মোককচাঙ্গে আওদের)। কাছেই কোহিমা ভিলেজ।। স্থানীয় লোকেদের মুখে 'বড়া বস্তি'। বস্তিতে আঙ্গামী নাগাদের বাস। এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় জনবহুল গ্রাম।

কোহিমা ভিলেজে প্রাচীনকালে নাকি সাতটি হুদ আর সাতটি প্রবেশদ্বার ছিল। এখনও গ্রাম-প্রবেশের রাস্তায় নাগা ঐতিহ্যবাহী কারুকার্যখচিত একটি বিশাল কাঠের গেট, তার উপর মোষের শিঙের খড়্গ। বড়ো-বড়ো পাথর ছড়ানো চারদিকে। প্রতি বৎসর আঙ্গামী নাগাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব সেক্রেন্সির সময়ে কবাহুর জঙ্গল থেকে উপযুক্ত গাছের কাঠ দিয়ে গেট বানানো হয়।

এইবারে সেই প্রবেশদ্বার-উৎসবের কথা।

সেক্রেন্সি

সেক্রেন্সি শুধু আঙ্গামীদের নয়—সমগ্র নাগাভূমিতে একটি বিশেষ পরিচিত উৎসব।

উপজাতীয় উৎসবের সমস্ত বৈশিষ্ট্য আঙ্গামী-নাগাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব সেক্রেন্সিতে বর্তমান। এ উৎসবে পুরুষদের ভূমিকাই প্রধান। বিশেষ করে আঙ্গামী পুরুষদের উপরেই সেক্রেন্সি উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ভার। কারণ অতীতে তারা সংগ্রামে ব্যস্ত থাকত সমস্ত বছর ধরেই এ-গ্রাম সে-গ্রামের সঙ্গে, আর প্রতি বছরই এই উৎসবের মাধ্যমে

উপাস্য দেবতার উদ্দেশে ভোগনিবেদন করত সৌভাগ্য আর সুদেহের জন্যে। যদি যথোচিতভাবে পুজো না দেওয়া হয়—প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী কোনো নাগাই সুখ সৌভাগ্য আর উত্তম ফসলের অধিকারী হতে পারে না, বরং তাদের জীবনে নেমে আসে দুঃখ-দুর্দশার কালো ছায়া।

সেক্রেন্যি উৎসব দ্বিতীয় নাগামাসের ২৫তম দিবসে শুরু হয়ে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসৃত। বৎসরের দ্বিতীয় চান্দ্রমাসের ২৫তম দিবসে শুরু—আঙ্গামী ভাষায় যে মাসকে বলা হয় "কেনুয়ো"। ইংরেজি মাসের হিসেবে সাধারণত ফেব্রুয়ারিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

'সেক্রেন্যি'র বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'পবিত্র উৎসব', 'সেক্রে'—পবিত্র, 'ন্যি'—উৎসব। 'গেন্নাবুড়া' (নাগা পুরোহিত) এই উৎসব যথাবিহিতভাবে পালন করার নির্দেশ দেন।

উৎসব শুরু হয় 'কিসিয়ে' অনুষ্ঠান দ্বারা। এই সঙ্গোপন অনুষ্ঠান অতি প্রত্যুষে গৃহকর্ত্রী সম্পন্ন করেন যখন বাড়ির সবাই গৃহে উপস্থিত। গৃহদ্বারে স্থাপিত পত্রাচ্ছাদিত দুটি খুঁটিতে ছিটানো হয় বিশেষভাবে প্রস্তুত চালের জল—"জুমুহো"। পূজার জন্য আবশ্যকীয় সমস্ত উপচার, বিশেষ করে মোরগ-মুরগি সংগ্রহ করে রাখে পরিবারের পুরুষ ব্যক্তিরা। সন্ধ্যে বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন বিশ্রাম নিতে যান তখন তরুণরা খড়ের মশাল জ্বালিয়ে গ্রামের কুয়ো বা পুকুরের জল পরিষ্কার করে রাখে পরের দিনের উৎসবের জন্যে। এরপর কোনো রমণী জল আনতে পারবে না উৎসবের তৃতীয় দিনের সন্ধে পর্যন্ত।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনকে বলা হয় "সেক্রে"। অতি ভোরে শিশু ছাড়া সমস্ত পুরুষ পূর্ণ যোদ্ধবেশে পূর্বরাত্রে পরিষ্কৃত কুয়ো বা পুকুরের জলে অবগাহন করে নেয়। পবিত্র দেহ-মনে তারা দেবতার কাছে সুস্বাস্থ্য আর সৌভাগ্যের জন্যে প্রার্থনা জানায়। গৃহে প্রত্যাগমনের পরে পিতা বা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ গৃহকর্তা দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করে। এক-একটি পুরুষ-পাখি বা মোরগ উৎসর্গ করা হয় এক-একজন পুরুষের নামে, এবং এক-একটি স্ত্রী-পাখি বা মুরগি পরিবারের প্রতি রমণীর পক্ষ থেকে। ডান হাত দিয়ে পাখিগুলির গলা ধরে যখন উপাস্য শক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়—তখন যার নামে পাখিটি উৎসর্গ করা হচ্ছে সে তার প্রার্থনা নিবেদন করে। এইভাবে একে-একে পরিবারের সবার নামে যখন বিহগবলি সমাপ্ত হয় তখন পাখিগুলি রন্ধনের উপযুক্ত করে ছাড়িয়ে নেয় পুরুষেরা। পুরুষেরাই নতুন চুল্লিতে এবং নতুন বাসনপত্রে মাংস রান্না করে। এরপরে প্রার্থনা।

প্রার্থনার পরে পুরুষেরা গ্রহণ করে পুরুষদ্বারা বিশেষভাবে প্রস্তুত পানীয়—'মহোপিভা'। পুরুষেরা মহোপিভা পান না করা পর্যন্ত রমণীরা কোনো আহার্য গ্রহণ করতে পারবে না।

তৃতীয় দিনকে বলা হয় "থেপ্রুয়ো"। এই দিন সন্ধ্যে পুরুষেরা হাত মুখ ধুয়ে এবং রান্নার বাসনপত্র ভালো করে পরিষ্কার করে নেয় এবং অবশিষ্ট মাংস যদি কিছু থাকে তা ফেলে দেয়। তারপর গ্রাম-সীমানার বাইরে গিয়ে প্রার্থনা করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উৎসবের পাঁচদিন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোনো পুরুষ নারী সহবাস করবে না।

উৎসবের আরেকটি অঙ্গ "থেক্রাহিয়ে"। এটি তরুণদের আয়োজিত প্রদর্শনী। উৎসবের চতুর্থ দিনে শুরু হয়ে এটি তিনদিন চলে। "থেক্রাহিয়ে" উৎসবে সমস্ত তরুণ তরুণী আপন উপজাতীয় পোশাকে ভূষিত হয়। শিরোভূষণ, কণ্ঠহার, জানুভূষণ, অঙ্গদ প্রভৃতি পরিধান করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্রমাগত নৃত্য-গীতে মত্ত থাকে।

কোহিমায় "গ্রাম-প্রবেশদ্বার-অভিষেক-যাত্রা" অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম দিনে। একে 'পবিত্র গ্রামদ্বার স্থাপন' অথবা 'গ্রামদ্বার-অভিষেক-অনুষ্ঠান' বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে বলা হয় Gate-Pulling Ceremony।

উঁচু পাহাড়ের জঙ্গল থেকে ভালো কাঠ নিয়ে একটি গেট তৈরি করে একটি বিশেষ জায়গায় রাখা হয়। গেটটি নাগাশিল্পকর্মশোভিত। এটি সর্বদা সম্পূর্ণ একখণ্ড কাঠ দিয়ে তৈরি। সাধারণত দৈর্ঘ্যে আট-দশ ফুট, প্রস্থে একটু কম।

উৎসবের দিন ভোরে গাঁওবুড়া একটা নতুন পিঠে, মধু আর একটা মুরগি নিয়ে যেখানে গেটটি বানিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে যান। কলাপাতায় খানিকটা 'মধু' ছড়িয়ে দেওয়া হয় মুরগিটাকে। মুরগিটা 'মধু' পান করলে সেটাকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এই 'মধু' হল নাগাভূমির দেশজ পানীয়।

গাঁওবুড়া লতার দড়ি আর তার সহায়কদের নিয়ে গেট স্পর্শ করে বলে—তোমাকে আমরা এখন তোমার যোগ্য জায়গায় নিয়ে যাব। গ্রামবাসী এবং আরও অনেক সজ্জন সম্মানের সঙ্গে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের গ্রামেও শস্য আর গৃহপালিত পশুর দেখা দেবে প্রাচুর্য। আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি হবে নির্বাধ।

গেটটিকে শক্ত, ছিঁড়বে না এমন লতার দড়ি দিয়ে বাঁধায় দুটি ছেলে সাহায্য করে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে—যারা অবিবাহিত এবং কখনও নারীসংস্পর্শে যায় নি। গেটটির দুটি দিক শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা হয়। লতার প্রান্তে আবার জুড়ে দেওয়া হয় লতা। এইভাবে দুই প্রান্তের লতা দীর্ঘ হয় প্রায় এক মাইল। লতার সঙ্গে দড়িও ব্যবহৃত হয় পরে। গেটের দুপ্রান্তে বাঁধা দুই লতা-দড়ি ধরে, দু সারি উপজাতীয় যোদ্ধবেশে সজ্জিত আঙ্গামী-নাগারা গেটটিকে টেনে নিয়ে চলে কোহিমা গ্রামের দিকে। টেনে নিয়ে যাবার মিছিলে খ্রীষ্টান নাগারাও যোগ দেয়।

সেক্রেন্যি-উৎসবের প্রথম দিনে আন্তর্গ্রাম নিমন্ত্রণ-ভোজও অনুষ্ঠিত হয়। এক গ্রামের নাগারা প্রতিবেশী গ্রামে নিমন্ত্রিত হলে উপজাতীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে মিছিল করে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। সেখানে গিয়ে অতিথি হিসাবে পূর্ণ মর্যাদায় নয়দিন অবস্থান করে, পানভোজনে আপ্যায়িত হয়ে দশম দিনে স্ব-গ্রামে প্রত্যাগমন করে।

"থেন্যি-মি" বলা হয় উৎসবের একাদশ দিবসকে এবং "থেরা" দ্বাদশ দিবসকে। এই দুটি দিন উৎসবের সমাপ্তিসূচক। উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো নাগা কাজ করতে যাবে না।

সেক্রেন্যি উৎসবে গেন্নাবুড়ার একটি বিশেষ সম্মানসূচক ভূমিকা আছে। 'গেন্না' মানে—প্রচলিত রীতিনীতি, অনুশাসন। 'গেন্নাবুড়া'কে বলা যায় 'নাগা-পুরোহিত' যিনি প্রচলিত রীতিনীতি উৎসব-অনুষ্ঠানে নির্দেশ দেন। সেক্রেন্যি উৎসব তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—আঙ্গামী বিবাহে 'গেন্নাবুড়া'র ভূমিকা একেবারেই গৌণ।

আঙ্গামী বিবাহ

ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগারা সবাই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বলে তাদের বিবাহ খ্রীষ্টীয়প্রথাসম্মত। প্রায় প্রত্যেক নাগা সম্প্রদায়ের আলাদা-আলাদা চার্চ রয়েছে। যেমন—আঙ্গামী ব্যাপটিস্ট চার্চ, সেমা চার্চ, লোথা ক্যাথলিক চার্চ ইত্যাদি। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান নাগাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতির উপাসক (অ্যানিমিস্ট) নাগাদের বিবাহপ্রথা খুবই সহজ সরল।

সমস্ত নাগা নরনারীই কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত। স্কুলকলেজগামী নাগাদের তো কথাই নেই—অফিসগামীরাও বৎসরের বিশেষ কৃষিকাজের সময়ে অফিসে না গিয়ে খেতে কাজ করে ফসল ফলাবার জন্যে। নাগা তরুণ-তরুণীরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ-কর্ম করতে অভ্যস্ত বলে তাদের মধ্যে একটা সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই জীবনসঙ্গী নির্বাচনে তাদের তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। বিবাহও বিলম্বিত নয় এদের জীবনে। বিবাহের তাগিদ

অনুভব করলে স্বভাবতই ছেলেরা অগ্রণী হয়ে ওঠে। মনোনীত মেয়েটির বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোনো গ্রামবৃদ্ধাকে। তিনি গিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন। বিবাহ-ব্যাপারে বিবাহেচ্ছুকদের মতামতই সর্বাগ্রগণ্য।

তরুণ পাত্রের বিবাহ-প্রস্তাবকে উপযুক্ত মনে হলেও কোনো নাগা-তরুণী সরাসরি তার সম্মতি জানায় না। চিন্তা-ধ্যান-স্বপ্নে যুবতী তার অন্তরে শুভবার্তা-মঙ্গলের ইঙ্গিত পেলে তবেই পরিণয়-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলে।

আসন্ন বিবাহের শুভাশুভের ইঙ্গিত পাবার জন্যে বরের পিতা অনেক সময় একটি মোরগের গলা মুচড়ে ফেলে দিয়ে লক্ষ করে কোন্ দিকে পা ছড়িয়ে মোরগটি মারা গেল। যদি সংস্কার অনুযায়ী অমঙ্গল-সূচক দিকে পা ছড়িয়ে মারা যায় তবে বিবাহ-প্রস্তাব ভেঙে দেওয়া হয়।

নির্দিষ্ট দিনে পাত্রীর ছেলেবন্ধুর সঙ্গে পাত্রীকে পাঠানো হয় তার ভাবী স্বামীর বাড়িতে। পাত্রীর সঙ্গীর হাতে থাকে নাগাবর্শা—সুরক্ষার প্রতীক। সঙ্গীর প্রহরায় সঙ্গোপনে তার ভাবী স্বামীর কাছে প্রাথমিক আলাপচারিতা সমাপনের জন্যেই আঙ্গামী কন্যার এই যাত্রা।

প্রকৃতি-উপাসক আঙ্গামী-কুমারী সর্বদা কেশ কর্তন করে। পরস্পর উপজাতির মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের পরিবেশে অবিবাহিতা কন্যাকে কুরূপা রাখবার চেষ্টা থেকেই এই প্রথার প্রচলন। খ্রীষ্টান আঙ্গামী-কুমারী অবশ্য তার কেশ সংরক্ষণ ও বিন্যাসের অধিকারিণী। প্রকৃতি-উপাসক আঙ্গামী মেয়ে কেবল-মাত্র বিবাহের পরেই কেশ-রক্ষণ ও পরিচর্যার অধিকারিণী। কেশকর্তন তার কুমারীত্বের স্মারকও বটে। নাগা বিবাহে ভোজ-উৎসবের সমারোহ নেই বিবাহের দিনে। শুধু বর আট-দশটা মোরগ-মুরগি দেবে কনের মা-বাবাকে, আর একটা বেশ বড়ো মোরগ দেবে তার স্ত্রীর পূর্বতন সঙ্গীকে যার সঙ্গে এতদিন মাঠেবাটে কাজ করেছে আঙ্গামী কন্যা তার সঙ্গে পরিণয়ের পূর্বে।

এই সহজ সরল নাগা বিবাহে আত্মীয়স্বজন-গাঁওবুড়ার সমক্ষে পাত্র-পাত্রী স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিবাহের পরে যুগ্মজীবনযাত্রায় আঙ্গামী স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে মাঠে যাবে "খেতি" করতে। পাথর ভাঙবে, মাটি কাটবে—কাজকর্মে সুখে দুঃখে একসঙ্গে চলবে জীবনের পথে। এই জীবনে হঠাৎ বিচ্ছেদও আসতে পারে। আর বিচ্ছেদ যদি আসেই তাও সহজে স্বীকার করে নেয় তারা। বিচ্ছেদ সম্পর্কে যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গাঁওবুড়ার আদালতে। গ্রাম-আদালতের সিদ্ধান্তের ফল অধিকাংশ সময়েই বিবদমান পক্ষের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী অর্থব্যয় এবং কিছু নিরীহ পশু-পাখি দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। সেজন্য প্রাপ্য কঠিন দণ্ড।

কিন্তু বিচ্ছেদ বা ব্যভিচারের ঘটনা তুলনায় কম। অধিকাংশ নাগা দম্পতি সুখে দুঃখে ঘরসংসার করে।

আঙ্গামী বিবাহে কনে পক্ষকে কিছুই দিতে হয় না, বরং আরও অনেক উপজাতির মতো পাত্রপক্ষই কনের পিতাকে পশুধন উপহার দেয়।

কিন্তু বিবাহের পরে নিজের হাতে শাল বুনে স্বামীকে উপহার দিতে না-পারলে সেটা খুবই অ-গৌরবের, প্রায় সব নাগা স্ত্রীর কাছেই।

নাগা শাল

বিভিন্ন নাগা উপজাতি আলাদা-আলাদা রঙ আর নকশার চাদর বুনে গায়ে দেয়। এমনকী, কখনও-কখনও একই উপজাতির মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী নাগাদের শালের ডিজাইন আলাদা।

আগে পরিধেয় শাল দেখে বিভিন্ন নাগার নিজস্ব উপজাতির স্বরূপ বোঝা যেত, কিন্তু আজকাল শহুরে আধুনিক নাগারা যার যেমন খুশি শাল ব্যবহার

করছে। এই শাল নাগা নারী পুরুষ প্রয়োজনমতো গায়ে দেয়।

আঙ্গামীদের মধ্যে তিন ধরনের শাল—লোয়হে, লোরামহোস্থ আর টেইপাই। তৃতীয় ধরনের শাল আজকাল খুব কমই দেখা যায়।

লোয়হে শালের জমিতে আর ধারে হালকা গোলাপি, সবুজ আর কালো রঙ। কোথায় কোন্ রঙ কতটা লাগাতে হবে তার একটা মোটামুটি মাপ আছে। এই শাল পুরুষদের পরবার জন্যে।

সাদা রঙের শাল হল লোরামহোস্থ। এই শালের মাঝের জমিতে নানারকম সূচীশিল্প। বর্ডার হয় হালকা গোলাপি বা লাল। নারী পুরুষ সবাই এ শাল পরতে পারে। নীল রঙের টেইপাই শুধু মেয়েদের পরবার জন্যে। মেয়েরা সাদা সুতো দিয়ে চাদর বুনে রঙ করে নেয় এই শাল। আঙ্গামী, আও ও লোথা নাগাদের মধ্যে এইভাবে শাল রঙ করার প্রথা রয়েছে। তবে টেইপাই শালের প্রচলন প্রায় নেইই।

আও-নাগাদের শালকে বলা হয় শিবাংস্থ। লাল আর কালো রঙের এই শালের মাঝখানে ইঞ্চিচারেক জায়গা সাদা। সেই সাদা অংশে নরমুণ্ড, মিথুনমুণ্ড, হাতি, বাঘ, মোরগ ও প্রাচীন নাগা-মুদ্রা 'জাবিলী'র ছবি। নরমুণ্ড চিত্রটিতে অতীতের হেড-হানটিঙের স্মৃতিচিহ্ন। তেমনি মিথুন—সম্পদের, হাতি—বিশালতার, বাঘ—ভয়ঙ্কর সাহসের, মোরগ—সতর্কতা ও সৌন্দর্যের, 'জাবিলী', স্বভাবতই টাকা-পয়সার প্রতীক। শালের এই চিত্রগুলির মধ্যেই নাগাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য আর আশা-আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত।

আরও একটি আকর্ষণীয় নাগা চাদর আছে। যেমন সেমা নারীরা চমৎকার ডিজাইনের সূচীশিল্প-সমন্বিত শাল বোনে। সব নাগা মহিলারাই শাল বোনায় দক্ষ। রেঙ্গমা নাগাদের শাল সাদা রঙের, বর্ডারে কালো লাইন আর তার ওপরে বৃত্তের মধ্যে কড়ির ছবি। লোথা নাগারা গায়ে দেয় নীলরেখাঙ্কিত কালো চাদর। চাখেসাঙ্গ অঞ্চলের রাজিয়েমা উপজাতির শালে হাতি আর পাখির ছবি।

শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্যে নাগারা তাদের চাদরগুলি খুব ঘন করে মজবুতভাবে বোনে যাতে গায়ে জড়িয়ে শীত ঠেকানো যায়। সূচীশিল্প-সমন্বিত শাল তারা অনুষ্ঠানবিশেষে উপহার দেয় মান্য অতিথিকে, আপ্যায়ন করে আপন উপজাতি-সঙ্গীতে।

আঙ্গামী সঙ্গীত

আঙ্গামী সঙ্গীত বা কবিতায় একদিকে যেমন আছে অতীতের শৌর্য আর বীরত্বের কাহিনী—তেমনি অন্য-দিকে রয়েছে তরুণ-তরুণীর চিরন্তন মানবিক আবেগ—প্রেম বিরহ-আনন্দ-বেদনার কথা। ভারতসীমান্তে এই দূর-দুর্গম শৈলরাজ্যের যুবক-যুবতীর আবেগ-প্রকাশের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতাসমুজ্জ্বল মহানগরীর তরুণ-তরুণীর হৃদয়াবেগের খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়বে না।

সঙ্গীত আঙ্গামী-জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই গানগুলি পূর্বে লিপিবদ্ধ হয় নি, লোককণ্ঠে প্রবাহিত হয়ে আসছে বংশপরম্পরায়। বর্তমানে নাগাভূমিতে শিক্ষার সার্বিক বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন নাগা সাহিত্যকেও রক্ষার প্রয়াস শুরু হয়েছে। নাগাল্যান্ডের উরা অ্যাকাডেমিতে গ্রন্থবদ্ধ করা হচ্ছে নাগা লোকসাহিত্যকে।

আঙ্গামী লোককবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সিলেবল্ গোনা হয়। প্রতি লাইনে সাধারণত নটি স্বর (syllable) এবং একটি পঙক্তিই কবিতার মতো। অরণ্যে রাখাল এবং একক গায়কের গান ছাড়া অন্য সঙ্গীত ন-টি সুরের (note) মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি লাইনে ন-টি সিলেবল্ থাকলে সমস্ত সুরে তাকে আবদ্ধ করা সম্ভব এবং অনুষ্ঠানের উপযোগী হলে এই এই গানে তারা ভাবপ্রকাশের উপর গুরুত্ব দিতে

ভালোবাসেন।

আঙ্গামী লোকসঙ্গীতে ছন্দ (rhythm) এবং তালের (metre) কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। গাইবার বা বলবার ভঙ্গির উপরেই তাল বা ছন্দ নির্ভরশীল। এই সঙ্গীতে রয়েছে পাঁচটি স্পষ্ট স্বরভঙ্গি (intonation)। একটি শব্দই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে পাঁচটি ভিন্ন অর্থ দ্যোতিত করতে পারে। সুতরাং শব্দের স্বরভঙ্গির পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। পঠিতব্য কবিতায় দুটি উচ্চ সুরে বেশি ঝোঁক(stress) দেওয়া হয়, বাকি তিনটি সুরে সাধারণত তেমন কোনো জোর দেওয়া হয় না।

আঙ্গামীদের সমস্ত অনুষ্ঠানেই সঙ্গীত অপরিহার্য। সমবয়সীদের উৎসব অনুষ্ঠানে ভোজনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রবাহিত হয় সঙ্গীত-তরঙ্গ। এইভাবে তারা কবিতা বা সঙ্গীতে শিক্ষা গ্রহণ করে। বিভিন্ন ঋতুতে খেতে কৃষিকাজ করার সময়েও তারা গান গায়। সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের আলাদা-আলাদা গান আছে। কাব্য-সঙ্গীতবিহীন অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ। নাগারা তাদের মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যেমন খুঁজে পায় গানের মধ্যে দীর্ঘ গদ্য-বাহিনীর মধ্যে ততটা নয়। পরিশ্রমের মধ্যে সঙ্গীত তাদের শ্রম দূর করে আনন্দ সঞ্চার করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—আঙ্গামীরা তাদের কাব্য-সঙ্গীতের সঙ্গে "চোট্টু" নামে একটি তারের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। অন্য একটি তারযন্ত্রের নাম "থেকু"। বাঁশিও ব্যবহৃত হয় প্রয়োজনবোধে।

একটি আঙ্গামী সঙ্গীত—

প্রতিরাতে মেহৌভিউ তার ঘুমের মধ্যে / ঘুরে আসে কিডেইমা বস্তিতে মোরুসার ঘরে—/ সেখানে তারা একসাথে খেয়ে নেয় / মধু আর জু / হয়তো এটা একটা সুন্দর স্বপ্নই কেবল / কারণ মেহৌভিউর সঙ্গে তো শেষ অবধি / বিয়ে হল না মোরুসার— / তারা থেকে গেল শুধু বস্তির লোকের গল্পকথায়……

[মধু=নাগা দেশজ মাদক পানীয়, জু=নাগা খাদ্য]

এই গানের মধ্যে সব কথা বলা হয় নি। কারণ সব কালের সব উপজাতির মানুষের জানা এই গানের কাহিনী। যার সেই অতীত কাহিনী জানা নেই, তার কাছে এ গান অর্থহীন।

[বলা বাহুল্য, এই রচনার সমস্ত আঙ্গামী কবিতার অনুবাদে মর্মার্থ প্রকাশের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে এবং গ্রহণ করা হয়েছে অপরিহার্য স্বাধীনতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য।]

সে-কাহিনী কিডেইমা বস্তির বীরযোদ্ধা মোরুসার। শুধু বীরযোদ্ধাই নয়—মোরুসা ছিল এক সুদর্শন তরুণ-ও। সে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজ গ্রামে উপযুক্ত কোনো জীবনসাথী খুঁজে পেল না। প্রতিবেশীরা পাশের গাঁয়ের এক অতি সুন্দরী কন্যার খোঁজ এনে দিল। মোরুসা তখনই তার এক অনুচরকে পাঠিয়ে দিল সেই রূপসী যুবতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। মোরুসার বীরত্বের খ্যাতির কথা সেই মেয়েটির কানেও পৌঁছেছিল। তাই সানন্দে সে বিবাহে সম্মতি জানাল। ঠিক হল বিবাহের দিন। মোরুসা তার বীরত্বের পরিচয় দিতে চাইল বিবাহের দিনে। তাই পাশের এক গ্রামে গেল সে নরমুণ্ড-শিকারে। বিবাহের দিনে একটি নরমুণ্ড শিকার করে নিয়েও এল সে। এদিকে তার সব বন্ধু বিয়ের দিনে এসে জমা হয়েছে। তারা সবাই পান-ভোজন-সঙ্গীতে মত্ত। সন্ধে থেকে তারা বধূ-আগমনের অপেক্ষা করছে রীতি অনুযায়ী। কিন্তু রাত গভীর হল; মোরুসার প্রত্যাশিত বধূ আর এল না। মোরুসা ভাবল—পাত্রীটি তাকে প্রতারণা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জানতে পারল—সে সুন্দরী তরুণী সত্যিই তাকে ছলনা করে নি। বরং নববধূকে উপহার দেবার জন্যে নিজের শক্তি প্রমাণের উদ্দেশ্যে যে নরমুণ্ডটি সে শিকার করেছে—সেটি ছিল তারই নির্বাচিত বধূ মেহৌভিউর।

এই সঙ্গে আর-একটি চমৎকার ভাবগ্রাহী আঙ্গামী কবিতার উল্লেখ করা যায় যার মধ্যে আভাসিত আঙ্গামী নাগা-জীবনের শৌর্য, দৈনন্দিন বিপদ-ঘেরা জীবন, আর নাগা-নারীর কল্লোলিত ভালোবাসা—

তোমার জন্ম উজ্জ্বল তারার মতো, দেহে যৌবনের দ্যুতি, / আমার সঙ্গে জীবন শুরু করার পরে সে বছর / পাখি ধরতে গেলে জঙ্গলের মধ্যে এক সকালে।

খবর নিয়ে এল গাঁওয়ের লোকেরা, হায়, / শত্রুর হাতে মারা গিয়েছ তুমি, সাধের শালটি নিয়ে ছুটলাম / যা আদর করে কোনোদিন জড়াও নি তোমার গায়ে।

তখন আমরা পরস্পরকে বুঝি নি তেমন ভালো করে / কোনও দিন তুমি ছেড়ে যাওনি আমাকে দূরে— / এখন যখন জানছি তোমাকে ধীরে-ধীরে, চলে গেলে, প্রিয়তম?

আঙ্গামী ছেলেমেয়েরা খেতে কাজ করতে-করতে নিম্নলিখিত প্রেমসংগীতটি গেয়ে থাকে। গানটিতে প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলছে—

রুদিতসৌ, তোমার হাত থেকে ছড়িয়ে দাও ফসলের বীজ / তোমারই মতো ডগোডগো হয়ে বড়ো হবে তারা। / যখন মধুর অতীতের কথা ভাবি / মন ছুঁয়ে যায় ভালোবাসা, ওগো দয়িতা। / যখন তুমি ছোটো ছিলে—তোমায় ভালোবাসতুম দশগুণ / এখনও সে ভালোবাসায় ভাঁটা পড়ে নি এতটুকু। / যদি কখনও ব্যথা পেয়ে থাক আমার কথায় / মাটির তলায় আজ পুঁতে দিয়ো সেসব কিছু। / মেয়েরা কদাচিৎ কথা দিয়ে কথা রাখে / তাই শপথ করো—করবে না ছল আমার সাথে। / যদি ঠাট্টা করেও বলে থাক—আমায় ভালোবাস / মেনে নাও সে-কথা, কারণ মিছে কথা বলা পাপ। / কত জায়গায় দেখা হয় কত মেয়ের সাথে / কোনো মেয়ে নয় সুন্দরী তোমার মতো। / চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—তুমিই আমার প্রেমিকা—শুধু তুমিই / কিন্তু পাছে শুনে ফেলে তোমার বন্ধুরা, তাই থাকি / চুপ, সাবধানী। / যদি কোনো নিশীথে তোমার কাছে যাই ভালোবাসা জানাতে— / ভোরবেলা পড়শীরা পুছবে—'কে এসেছিল রাতের বেলা?' / চাবি দিয়ে রেখো ঠোঁটে তোমার, গম্ভীরভাবে এনো অন্য প্রসঙ্গ।

অনেক আঙ্গামী সঙ্গীতে ব্যক্তিগত শৌর্যের কাহিনী, অথবা মহৎ মানুষের মৃত্যু, কিংবা পরম আদরের শিশুর, পরম্পরাগত ভাবে কাব্য-সঙ্গীতের ধারায় কণ্ঠে-কণ্ঠে এই কাহিনীগুলি প্রবাহিত হয়ে আসছে, পূর্বেই উল্লিখিত। তাই সাধারণ ঘটনা স্বভাবতই এই সঙ্গীতস্রোতে বাহিত হয়ে আসে নি, শুধু বিশেষ ঘটনা বা কাহিনীকে নাগারা তাদের সঙ্গীতে আবদ্ধ করে রেখেছে যা তাদের ইতিহাসের সামগ্রী। তাই আঙ্গামী লোকসঙ্গীতে শোনা যায় দুই গ্রামের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা জয়-পরাজয়ের কথা, দুই বীর ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কাহিনী, কোনো গ্রামের বিশিষ্ট গুণের গল্প—যার মধ্যে আভাসিত নাগা-উপজাতির আপন ভাবনা, মনন এবং দর্শন।

একটি আঙ্গামী বিবাহ-সঙ্গীতে, সখীরা পরিণয়ের পরে তাদের সাথী নববধূ গ্রামে ফিরে এলে তাকে বলছে—

ওগো গরবী মেয়ে, তুমি নতুন-পাওয়া ঘরের ভাবনায় মগ্ন / ভাবছ তোমার নব পরিবেশ, নতুন সাথীদের কথা / —মনে হয় একেবারে ভুলেই গেছ আমাদের সব / তোমার আগের জীবনের সঙ্গী-সাথীর স্মৃতি। / কিন্তু আমরা তোমায় ভুলি কেমন করে? / যখন সবাই মিলে নাচি, গান গাই, খেলি / অথবা যাই মাঠে খেতির কাজে / তোমার স্মৃতি সাথে থাকে আমাদের / —তোমার কথা ভাবি আমরা সবাই। / কিন্তু, ভুলে গেলেও তোমায় দুষি কেমন করে? / কোনো মেয়ের পক্ষে এই-ই তো স্বাভাবিক / বাপের ঘর—আপনজন ছেড়ে দিয়ে / শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর ঘর করা / —এই তো মেয়েদের জীবন, এই তো আমাদের প্রথা।

মতামত

১

প্রসঙ্গ "অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়"

ডিসেমবর ১৯৯০ "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় আমার লেখা "অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়: ১৯৩৭-৪৭" প্রবন্ধটির বিষয়ে বেণু গুহঠাকুরতা ও পার্থসারথি রুজের সমালোচনার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ ক্রিপস মিশন ও ক্যাবিনেট মিশন বিষয়ে ভ্রান্তি আমার অসাবধানতার জন্য ঘটেছে।

ওই সংখ্যার প্রচ্ছদে বলা হয়েছে যে, অবিভক্ত বাঙলার শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস রচনায় অসাবধানতার অভিযোগ এনেছেন জনৈক 'মনোযোগী' পাঠক। কিন্তু পত্রলেখক গুহঠাকুরতাকে আমার কখনোই মনোযোগী পাঠক বলে মনে হয় নি। আমি পত্রলেখকের সমালোচনা থেকে দেখাব যে, তিনি অমনোযোগী হয়ে এমন অনেক কথা বলেছেন যা আমি কোথাও বলি নি।

প্রথমত, এই প্রবন্ধে আমি কোথাও বলি নি বা দাবি করি নি যে এই লেখাটি বাঙলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। পত্রলেখক যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন—যেমন, ১৯৩৭-৩৮-এর ছাত্রদের বন্দিমুক্তি আন্দোলন, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ ইত্যাদি বিষয়গুলি আমি ইচ্ছে করেই বাদ দিয়েছি। লেখক যদি মনোযোগী পাঠক হতেন, তবে বুঝতে পারতেন যে আমি আমার রচনাটি শুধু-মাত্র বাঙলাদেশের রাজনীতি, ফজলুল হক ও মুসলমান রাজনীতি, বাঙলাদেশের রাজনীতিতে জিন্নার পরোক্ষ ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। তিনি লেখার মূল স্পিরিটটি ধরতে পারেন নি। তাই তিনি এত কথা বলেছেন, অথচ এগুলির কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

দ্বিতীয়ত, পত্রলেখক মুসলিম লীগ স্থাপনে সলিমুল্লার ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, ইংরেজদের ইচ্ছাতেই লীগ স্থাপিত হয়, সলিমুল্লার চেষ্টাতে নয়। কিন্তু মুসলমান-দের স্বার্থ যদি জড়িত না থাকত, তবে কি ঢাকার নবাব লীগ স্থাপনে এত আগ্রহী হতেন? তিনি কি ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য লীগ স্থাপন করেন?

তৃতীয়ত, পত্রলেখক ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে 'দলটি নির্বাচনের আগেই ভেঙে যায়' (পৃ ৬৬৬)। একথা আমি কোথাও বলি নি। লীগের কোনো প্রভাব না থাকায় জিন্না ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি এবং ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। লীগ দল হিসাবে প্রভাবশালী না হলেও, ফজলুল হকের চেষ্টায় মুসলমান জনসাধারণ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে ও পরবর্তী সময়ে লীগের সমর্থক হয়ে ওঠে।

চতুর্থত, কিরণশংকর রায়-ফজলুল হক আলোচনা ভেঙে যাওয়ার প্রসঙ্গে পত্রলেখক আবার অমনোযোগী হয়েছেন। তিনি যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, আমি আগেই সেই প্রসঙ্গ ৩৪৭-৪৮ পাতায় উল্লেখ করেছি। তাঁর এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

পঞ্চমত, পত্রলেখকের মতে, লীগের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে হক-লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তাই ফজলুল হক কেন নতুন করে লীগের ওপর নির্ভরশীল হবেন? এখানে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। ফজলুল হককে লীগ সমর্থন করে, কারণ হকের জনপ্রিয়তাকে অবলম্বন করে লীগ নিজেদের অবস্থাকে

ও সংগঠনকে মজবুত করতে চেয়েছিল। আমি এক জায়গায় বলেছি যে, পটুয়াখালির নির্বাচনে নাজিমুদ্দিনের পরাজয়কে লীগ-নেতারা কখনোই সহজ-ভাবে মেনে নিতে পারেন নি। লীগের একটি অংশ ভেতর থেকেই হকের বিরোধিতা শুরু করে। তখনো সেই বিরোধ প্রকাশ্যে আসে নি। তাই মূলত প্রজা-পার্টির মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে, হক অনেককেই দল থেকে বের করে দেন। এই অবস্থায় তিনি লীগের ওপর নির্ভরশীল হন। তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে চান নি। তাঁর মনে হয়েছিল যে, মন্ত্রিসভা থাকলেই জনসাধারণের জন্য কাজ করা যাবে। তাই প্রথমে জিন্নার বিরোধিতা করেও হক পরে তাঁর সঙ্গে হাত মেলান।

ষষ্ঠত, হক-লীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর বিষয়ে নেতাজী ও গান্ধীজীর মধ্যে চিঠি-চালাচালি হয়। গান্ধীজী কেন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি, নীরদচন্দ্র চৌধুরী সেই বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেন। নেতাজী বাঙলাদেশের লীগ-হক মন্ত্রিসভাকে ভেঙে দিয়ে হকের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা করেন। পত্র-লেখকের মতে নেতাজী মনে করেছিলেন যে এর ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনার সুবিধা হবে। কারণ কংগ্রেস ১১টি প্রাদেশিক সরকারে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কি সত্যিই হক-লীগ মন্ত্রিসভা বাতিল করা সম্ভব ছিল? গান্ধীজীও তা চান নি। এ প্রসঙ্গেই আমি নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মত উল্লেখ করেছি।

সপ্তমত, পত্রলেখককে আবার অমনোযোগী বলতে হচ্ছে। কারণ তিনি ৪৫০ পাতায় কর্পোরেশনের নির্বাচনের কোনো তথ্য নেই, আছে ৪৫৩ পাতায়। এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আমি তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছি। দয়া করে পত্রলেখক তাঁর সূত্র দাখিল করুন, তবেই তা গ্রহণযোগ্য হবে।

সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

২

'মনোযোগী' কিংবা 'অমনোযোগী' পাঠকের উত্তর

আমার চিঠি সম্পর্কে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য পড়লাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

ক্রিপস ও ক্যাবিনেট মিশন সম্পর্কে আমার কোনো 'সমালোচনা' ছিল না, কেবল তথ্যের অসঙ্গতি সম্পর্কেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি তার জন্য আমাকে এবং শ্রীপার্থসারথি রুজকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

৪৫৮ পাতায় উনি লিখেছেন, 'বাঙলার নির্বাচন শেষ হওয়ার আগেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন আসে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, পেথিক লরেন্স এবং এ. ভি. আলেকজানডারকে ভারতে পাঠান। এই কমিশন দলনেতা ক্রিপসের নামে ক্রিপস মিশন নামে পরিচিত। মিশন ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে উপস্থিত হয়।' এই কয়েক লাইন লেখার মধ্যে অনেকগুলি অসঙ্গতি আছে।

প্রথমত—কালটা কী ছিল? ১৯৪২, না ১৯৪৬? যদি ১৯৪২ সাল হয়, তাহলে বাঙলাদেশে নির্বাচনের কোনো প্রশ্ন আসে না। কারণ নির্বাচন ১৯৩৭ সালেই চুকে গিয়েছে। তাহলে কালটা দাঁড়াল ১৯৪৬ সাল। ১৯৪৬ সালের প্রথমে জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসেই এখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ পার্লামেনটে ক্যাবিনেট মিশন ভারতে পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে।

দ্বিতীয়ত—যদি কালটা ১৯৪৬ সালই হয়, তাহলে চার্চিল সাহেব সে সময় কোথা থেকে এলেন? সেক্ষেত্রে নামটা থাকা উচিত ছিল অ্যাটলি সাহেবের।

তৃতীয়ত—এর থেকে যেটা দাঁড়াল সেটা হল এটা

ক্রিপস মিশন নয়, হবে ক্যাবিনেট মিশন; এবং কালটা ১৯৪২ সাল নয়, ১৯৪৬ সাল।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন আমি তাঁর লেখার মূল স্পিরিট ধরতে ব্যর্থ হয়েছি। আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। তাঁর লেখার মূল বক্তব্য ধরতে পারার জন্যই আমার মনে হয়েছে তিনি যে কথা লিখেছেন সেটা তদানীন্তন বাঙলার একটি আংশিক ইতিহাস মাত্র। সেটা কোনোক্রমেই 'অবিভক্ত বাংলার শেষ অধ্যায় : ১৯৩৭-৪৭'-এর ইতিহাস নয়। এতে প্রাথমিক ত্রুটিটি তাঁরই। কারণ লেখার শিরোনাম সেক্ষেত্রে অন্যরকম হওয়া উচিত ছিল। তাহলে এত কথা উঠত না।

মুসলিম লীগ স্থাপনের ব্যাপারে আমাকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কিন্তু মুসলমানদের স্বার্থ যদি জড়িত না থাকত, তবে কি ঢাকার নবাব লীগ স্থাপনে এত আগ্রহী হতেন? তিনি কি ব্যক্তিগত স্বার্থের অন্য লীগ স্থাপন করেন?'

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় আমার চাইতেও অমনোযোগী, কারণ এ ব্যাপারে আমার মত আমি শ্রীসুমিত সরকারের "মডার্ন ইনডিয়া" বই থেকে দিয়েছিলাম ৬৬৫ পৃষ্ঠাতে। তিনি সেটি বোধ হয় পড়েন নি। আমি দেখিয়েছিলাম, লীগ স্থাপনের ব্যাপারে সলিমুল্লার উৎসাহের সূত্র আছে ১৫ই অগস্ট ১৯০৬ সালে লেখা তদানীন্তন ভারতের বড়লাট মিনটো কর্তৃক লিখিত চিঠিতে। তিনি ভারতসচিব মরলিকে লিখেছেন, পূর্ব বাঙলার গভর্নর ফুলার 'pressed Minto to sanction a Rs. 14 Lakh loan to Nawab Salimulla of Dacca as a political matter of great importance' (Ref: Sumit Sarkar) আর ড. রমেশ মজুমদার তো সরাসরি অভিযোগ করেছেন যে 'Lord Curzon brought round the Nawab of Dacca to his side by lending him 14 Laks of Rupees at a very low interest.' (History of Modern Bengal, Part 2, p 61).

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝলাম না। লীগের জন্মে এক শ্রেণীর মুসলমান এলিটের স্বার্থ নিশ্চয়ই ছিল. কিন্তু শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এতে সমস্ত মুসলমানের স্বার্থ জড়িত ছিল, এটা প্রমাণ করতে চান কেন? এ ছাড়াও, আমি আরও তথ্য এ ব্যাপারে আমার চিঠিতে উল্লেখ করেছি, কিন্তু শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সে ব্যাপারে নীরব।

পত্রলেখক ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে 'দলটি নির্বাচনের আগেই ভেঙে যায়' (পৃ ৬৬৬)। একথা আমি কোথায়ও বলি নি। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন আমার সম্পর্কে। উনি বলেছেন বলে আমি কোথায় বলেছি সেটা আমি লেখার ভেতর খুঁজে পেলাম না। এটা শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপটিক্যাল ইলিউশন নয় তো? তিনি তো দেখছি আমার চাইতেও অমনোযোগী। তবে কথাটা তিনি একেবারে বলেন নি সেটি ঠিক নয়। তিনি বলেছেন 'লীগ আর প্রজা পার্টির মধ্যে কোনো নির্বাচনী বোঝাপড়া না হওয়ায় দুইটি দলই পৃথকভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হয়।' (পৃ ৩৪৭)। আমার ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলাটা যদি অপরাধের হয় তবে স্বীকার করতেই হবে যে আমি অপরাধী। কিন্তু 'বাঙ্গালা দেশে মুসলীম লীগের কোনো প্রভাব না থাকায়' তাঁরা প্রজাপার্টির সঙ্গে ইউনাইটেড মোসলেম পার্টি গঠন করেছিলেন। সেই দলই নির্বাচনে প্রজাপার্টির চাইতে বেশি আসন কী করে পেল? সে প্রশ্নের জবাব শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতে পেলাম না। তাঁরই দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই পার্টি গঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালের মে মাসে। এমন কী অঘটন ঘটল যে ১৯৩৭ সালের প্রথমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই 'কোন প্রভাব না থাকা' দলটি প্রজাপার্টির চাইতে বেশি আসন লাভ করল?

কংগ্রেস-প্রজাপার্টি মন্ত্রিসভা কেন হল না—এই

প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন 'পত্রলেখক আবার অমনোযোগী হয়েছেন। তিনি যে প্রসঙ্গ অর্থাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, আমি আগেই সেই প্রসঙ্গ ৩৪৭-৩৪৮ পাতায় উল্লেখ করেছি। তাঁর এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।' আমি আমার লেখাতে, কোথায় বললাম যে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় একথা বলেন নি? তবে কি ধরে নিতে হবে যে মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়ার প্রধান কারণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঐ প্রস্তাব? এ ছাড়াও তো তিনি বলেছেন, 'অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব সর্বভারতীয় রাজনীতির কারণে বাঙলাদেশে মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি হন নি।' তাহলে বাঙলাদেশে প্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়ার দায়টা হক সাহেবের কাঁধে চাপালেন কেন? আর সেইখানেই আমার আপত্তি।

আমার প্রশ্ন ছিল যে, মন্ত্রিসভা ছিল প্রজা-লীগ মিলিত প্রয়াসের ফল, সেখানে মন্ত্রিসভা বানানোর জন্য নতুন করে লীগের উপর নির্ভরশীল হওয়ার প্রশ্ন উঠছে কোথায়? শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর আমার প্রশ্নের সমাধানে সাহায্য করে নি এটুকুই বলতে পারি।

হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্য সুভাষচন্দ্রের আর গান্ধীজীর মধ্যে যে বাদানুবাদ সৃষ্টি হয় তাতে মনে হয় মাড়োয়ারি স্বার্থ রক্ষার জন্য গান্ধীজী ওই মন্ত্রিসভা ভাঙতে চান নি। আমি এই মতটা ঠিক নয় বলে বলেছিলাম। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বলতে চাইছেন মতটা ওনার নয়, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর। কিন্তু তিনি হঠাৎ তাঁর মতটাই বা দিতে গেলেন কেন? উত্তরটা তাঁর লেখাতেই আছে। তিনি নীরদবাবুর মত টেনে এনেছেন কারণ 'গান্ধীজীর এই ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়' (পৃ ৩৫৫) এই কারণে। এরপর যদি কেউ ভেবে নেয় শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় নীরদবাবুর সঙ্গে একমত, তাহলে কি তাকে খুব দোষ দেওয়া যাবে? এ প্রসঙ্গে তো শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী বলেছেন, 'বিড়লা যে কারণে আপত্তি জানিয়েছেন বলে চৌধুরীর অনুমান তা কিন্তু ভ্রান্ত। লীগের পক্ষপুটে তিনি বেশি নিরাপদ এমন ধারণা বিড়লার মত ঝানু ব্যবসায়ীর হতে পারে না।' (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৮-১৯৪৭, ২৬ অধ্যায়, "দেশ", ১১.৯.৮৮) এই মতটাও তিনি দিতে পারতেন। দেন নি, কারণ নীরদবাবুর মতটাই তাঁর পছন্দ হয়েছিল বোধ হয়।

তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর চিঠিতে আবার নতুন বিতর্কের সূচনা করেছেন। 'পত্রলেখকের মতে নেতাজী মনে করেছিলেন যে এর ফলে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনার সুবিধে হবে। কারণ কংগ্রেস ১১টি প্রাদেশিক সরকারে রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কি সত্যিই হক-লীগ মন্ত্রিসভা বাতিল করা সম্ভব ছিল? গান্ধীজীও তা চান নি।' প্রথম কথা, আমার মতের কোনো প্রশ্ন এখানে নেই, সুভাষচন্দ্র তাঁর মত খুব পরিষ্কার করেই তাঁর গান্ধীজীকে লেখা চিঠিতে ব্যক্ত করেছেন। সেটা আমি আমার লেখাতে বিশদ উল্লেখ করেছি। আর গান্ধীজীও তা চান নি, এ সংবাদ তিনি কোথায় পেলেন? তিনি যদি Gordon A. Leonard-এর *Bengal, The Nationalist Movements 1876-1940* এই বইয়ের সূত্রে নীরদবাবুর মতামত সংগ্রহ না করে নীরদবাবুর *Thy Hand Great Anarch*-এর সাহায্য নিতেন তাহলে হয়তো এ সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না। এ ব্যাপারে শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠীও বলেছেন, 'বাংলায় হয়তো একটা বিকল্প সরকার গড়া যেত আর গান্ধী তাতে আপত্তি করেন নি। ২২শে ডিসেম্বর লিখেছেন 'I still hold the opinion if we can form a coalition ministry with honour and dignity, we shall unhesitatinly go for that' (ঐ, দেশ ১১.৯.৮৮)। এর থেকে কি প্রমাণ হল যে 'গান্ধীজী তা চান নি'?

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে আমার মতামতের তথ্যসূত্রের দাবি

জানিয়েছেন, তা নাহলে নাকি তা গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়কে দয়া করে Gene. D. Overstreet ও Marshall Windmiller লিখিত Communism in India বইটির ৫৬৪ এবং ৫৬৬ পৃষ্ঠা উল্টে দেখতে অনুরোধ করব। বইটির প্রকাশক University of Berkley। আমার আশ্চর্য লাগছে যে তথ্য সুদূর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের অজানা নয়, তা কলকাতার গবেষকের অজানা রয়ে গেল!

বেণু গুহঠাকুরতা
১এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা-১৩

৩

হস্তশিল্প এবং দাঙ্গা

গত কুড়ি বছর যাবৎ চাকরির ঘোরাঘুরিতে সারা দেশ চষে ফেলেছি। দাঙ্গার ব্যাপারে একটা জিনিস আমার নজরে এসেছে। কিন্তু কোনো আলোচনায় এ বিষয়ে—যাকে বলে আলোকপাত—তলিয়ে দেখা হয় নি মনে হচ্ছে। আমার যে-খটকাটা লেগেছে তা হল: কেন হাতের কাজের কেন্দ্রগুলোতে বার-বার দাঙ্গা হয়? দাঙ্গার পর দেখি কারিগর-মহাজনরা ছত্রখান, বাজার থেকে সেই হস্তশিল্প-কুটিরশিল্প-ক্ষুদ্রশিল্প আইটেম তার পর লোপাট হয়ে যেতে থাকে। যেমন আলিগড়ে তালা আর এনামেল-বাসন। জলগাঁওতে ধূপকাঠি। ভাগলপুরে তাঁতের কাপড়। ফিরোজাবাদে কাঁচ। মিরাটে কাঠের খেলনা আর তাঁত। মোরাদাবাদ-সম্বলে বাসন। লখনউতে চিকন। কানপুরে চামড়া। হায়দ্রাবাদে জড়োয়া আর কলমকারি। বেনারসে পাথরের বাসন। এটাওয়াতে পুঁথি। আরও অনেক আছে। ফর্দ বাড়িয়ে লাভ নেই।

এখন কথা হল এ জিনিসটা খোলশা করে দেখা দরকার। মুসলমান কারিগর আর হিন্দু মহাজন নিজেরা লড়ে মরতে চাইবেন না নিশ্চয়ই, কেননা ওঁদের রুজিরুটি আসে ওই ব্যাবসা থেকেই। তাহলে কেন হয়? কার লাভ হয়? কেউ কি অধ্যয়ন করে দেখবেন? অন্তত বেশ কিছু দাঙ্গা তাহলে সামলানো যাবে।

মলয় রায়চৌধুরী
নাবার্ড পার্ক, সান্তাক্রুজ (প),
বম্বে-৫৪

৪

পূর্ব ইউরোপে "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্র?

"চতুরঙ্গ"র মার্চ ১৯৯১ সংখ্যায় একটি বইয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: '...পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি...।' সোভিয়েত ইউনিয়ন এ পর্যন্ত কখনো কমিউনিস্ট দেশ বলে নিজের পরিচয় দেয় নি (১৯৫৩ পর্যন্ত বলশেভিক নেতৃত্বের আমলেও নয়, তার পরে মেনশেভিকদের আমলেও নয়); পূর্ব ইউরোপের যে দেশগুলি হালে খোলাখুলি ভোল পালটে ফেলল, তারাও নয়। বস্তুত, অদ্যাবধি পৃথিবীতে কোনো "কমিউনিস্ট" রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয় নি আসলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন বলশেভিক নেতৃত্বে পরিচালিত হত, তখন পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে জনগণতন্ত্র (people's democracy) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে যখন মেনশেভিকরা সোভিয়েত রাষ্ট্র সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি দখল করে নেয়, তখন ওই দেশগুলি ধীরে-ধীরে আধা-ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধঃপতিত হতে শুরু করে।

দিবাকর চৌধুরী
হাওড়া-১

৫

"অমর শিল্পী বুলবুল" সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

ফেবরুয়ারি ১৯৯১ "চতুরঙ্গে" কামাল হোসেন-কৃত "অমর শিল্পী বুলবুল" নামক গ্রন্থটির সমালোচনা পড়ে এই চিঠি লিখছি। মাহমুদ নুরুল হুদা-লিখিত "অমর শিল্পী বুলবুল" নামক গ্রন্থটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এটি বুলবুল সম্পর্কিত তৃতীয় গ্রন্থ বলে সমালোচক উল্লেখ করেছেন। আসলে এটি তৃতীয় নয়, চতুর্থ গ্রন্থ।

সমালোচক জনাব কামাল হোসেনের অবগতির জন্য ক্রম অনুসারে নীচে গ্রন্থগুলির নামোল্লেখ করছি।

(১) বুলবুল চৌধুরী—সুলতানা রাহ্মান লিখিত প্রথম গ্রন্থ, প্রকাশক—পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড। প্রথম মুদ্রণ, জুলাই ১৯৬২। মূল্য পাঁচ টাকা। (২) বুলবুল জীবনকথা—কলকাতার নীলরতন মুখোপাধ্যায় লিখিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। প্রকাশক: বইঘর, চট্টগ্রাম। প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ ১৩৮৪ (১৯৭৮)। মূল্য পঞ্চাশ টাকা। (৩) শিল্পী বুলবুল চৌধুরীর বাল্যজীবন—সুলতানা রাহ্মান। প্রকাশক: মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা। মূল্য বারো টাকা। (৪) অমর শিল্পী বুলবুল—মাহমুদ নুরুল হুদা (চতুর্থ গ্রন্থ)। সমালোচক কামাল হোসেন সাহেব পূর্বোক্ত গ্রন্থটির আলোচনাশেষে লিখেছেন: **আমি শুধু অপেক্ষায় আছি মৃত্যু-শিল্পী ও সাহিত্যিক বুলবুল চৌধুরীর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে কবে একটি বৃহৎ গবেষণাধর্মী গ্রন্থ লেখা হবে। এ-বাঙলায় কিংবা ও-বাঙলায়।**

হোসেন সাহেবের অবগতির জন্য জানাই যে, সুবৃহৎ গবেষণাধর্মী পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটিই লিখেছেন এ-বাঙলার লেখক নীলরতন মুখোপাধ্যায়। বুলবুল সম্পর্কিত লেখার জন্য ওপার-বাঙলার লেখকেরা এই গ্রন্থটিকেই একমাত্র 'রেফারেন্স বুক' হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশে এই গ্রন্থটি আসাদ চৌধুরী, আবুল হাসানাত, বশীর আলজেলাল প্রমুখ সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। এই গ্রন্থটি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে। প্রাপ্তিস্থান: একুশে, ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

কামাল হোসেন সাহেবকে আরেকটি সাম্প্রতিক বইয়ের সন্ধান দিচ্ছি। বুলবুল চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ—প্রকাশক: বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মূল্য পঁচিশ টাকা। প্রথম প্রকাশ: ডিসেমবর ১৯৮৯। এই গ্রন্থটির প্রকাশের ব্যাপারে বুলবুল-জীবনীকার নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের অবদান গ্রন্থটির ভূমিকায় স্বীকৃত। এ গ্রন্থটি সম্ভবত এ. মুখার্জী কোং-এর দোকানে পাওয়া যেতে পারে।

সোমা মুখার্জী
অধ্যাপিকা
বসিরহাট কলেজ
উঃ ২৪-পরগণা